সরকারি হিসাবেই ১০,০০০ আর কত আত্মঘাতী হবে কৃষক

সৌম্য চক্রবর্তী

গত প্রায় এক দশক ধরে ভারতের কৃষিক্ষেত্র এক অস্বাভাবিক সমস্যার সম্মুখীন। পাঞ্জাব, মহারাষ্ট্র, অন্ধ্রপ্রদেশ, কর্নাটক ও কেরলে হাজার হাজার কৃষক আত্মহত্যা করেছেন। সংখ্যাটা সরকারি হিসাবেই ১০,০০০-এর অনেক বেশি। একদিকে বেড়ে চলা চাষের খরচ আর অন্য দিকে বাজারের অভাব। এ দুয়ের ধাক্কা সামলাতে ক্রমশ মহাজনী ঋণের জালে জড়িয়ে গিয়ে চাষির সর্বস্ব খোয়ানোর ছবিটা কেমন যেন গা-সওয়া হয়ে গিয়েছে!

সমস্যাটার গভীরে ঢুকতে গেলে প্রথমেই আমাদের একটু পিছিয়ে যেতে হবে। খুব বেশি দিন নয়, বছর পাঁচ-সাত আগেই আমাদের সামনে এক অদ্ভুত সমস্যা হাজির হয়েছিল। হঠাৎ আমরা শুনলাম বাজারের চাহিদার তুলনায় বেশ কয়েকটা কৃষিপণ্যের জোগান নাকি অনেকটাই বেশি। আর তাই চাষি ফল বেচতে পারছেন না, বা পারলেও যথেষ্ট দাম পাচ্ছেন না। পশ্চিমবঙ্গের চাষিও, বিশেষত আলু চাষিরা সে-সময় দিশেহারা হয়ে পড়েছিলেন। ফসলের দাম এত কমে গিয়েছিল যে, মাঠের ফসল মাঠেই পড়ে ছিল। চাষিদের বাঁচাতে সরকার বাধ্য হয়েছিল উদ্বৃত্ত ফসল যতটা সম্ভব কিনে নিতে। অবশ্য দাম কমে যাওয়ার সুফল আড়তদার, বিশেষত মধ্যস্বত্বভোগীদের কল্যাণে ক্রেতা তেমন বুঝতে পারেননি।

হঠাৎ করেই কৃষির 'বাড়তি জোগানের' প্রশ্নটা সামনে এসে পড়েছিল। ঘটনাটি যে কতটা অস্বস্তিকর তা আরও ভালভাবে বোঝা যায় অধ্যাপক অমর্ত্য সেনের একটা উপমায় : ভারতবর্ষে না কি এতটাই খাদ্যশস্যের উৎপাদন যে, তা বস্তাবন্দি করে একটার উপর আর একটা বস্তা সাজালে এমনকী চাঁদও ছুঁয়ে ফেলা সম্ভব, অথচ সারা দেশ জুড়ে দারুণ অনাহার! আর এখন তো সমস্যাটা আরও জটিল। কৃষিপণ্যের উৎপাদন প্রচুর, কিন্তু তার অনেকটাই না কি দেশের বাইরে চলে গিয়েছে, তাই আবার আমদানি করতে হচ্ছে!

ভারতবর্ষে কৃষির সমস্যা নতুন কিছু নয়, কিন্তু আজকের সমস্যার চরিত্র একেবারেই অন্যরকম। প্রাকৃতিক বিপর্যয় বা সামাজিক অত্যাচারে মৃত্যু নয়, আমাদের দেখতে হচ্ছে সারা দেশ জুড়ে হাজার হাজার কৃষকের আত্মহনন! আর সবচেয়ে আশ্চর্য হল, বহু ক্ষেত্রেই এই দুর্ঘটনার কারণ বন্যা বা খরায় উৎপাদন-বিপর্যয় নয়, বরং অতিরিক্ত উৎপাদন! একদিকে অজস্র দরিদ্র মানুষের অনাহার-অর্ধাহার আর অন্য দিকে অতিরিক্ত উৎপাদনের কারণে চাষির আত্মহত্যা! সমাজবিজ্ঞানীর কাছে এ-এক গভীর সমস্যা। এই সমস্যার উৎস বা সমাধান সম্পর্কে একটা ইঙ্গিত মেলে গত দু'দশক ধরে একটু একটু করে বদলানো কৃষি-সংক্রান্ত সরকারি নীতির পর্যালোচনায়।

কৃষিনীতি-সংক্রান্ত যে কোনও বিতর্কে সরকারের তরফে বলা হচ্ছে, মাত্রাতিরিক্ত ভারসাম্যহীন জোগানই এখন ভারতীয় কৃষির অন্যতম মূল সমস্যা। তলিয়ে দেখা হচ্ছে না এই জোগান দরকারের তুলনায় সত্যিই বেশি কি না। উৎপাদিত কৃষিপণ্য দেশের সবার মধ্যে প্রকৃত প্রয়োজন অনুসারে ভাগ করে দিলে কি সত্যিই উদ্বৃত্ত থাকবে? আসলে ভেবে দেখা দরকার সমস্যাটা অতিরিক্ত জোগানের না অপ্রতুল চাহিদার? অথচ দারিদ্র-অনাহার-প্রয়োজন এ সব প্রশ্ন পাশ কাটিয়ে সরাসরি অতিরিক্ত জোগান

কমাতে কতকগুলি দাওয়াই বাতলানো হচ্ছে। এই সব দাওয়াই 'নয়া অর্থনৈতিক চিন্তা'র-ই ফসল।

বলা হচ্ছে, সরকারি সুযোগ-সুবিধাই অতিরিক্ত জোগানের মূল কারণ। অথচ এই সুযোগ-সুবিধাগুলি বহাল রাখা সম্ভব নয়। সরকারের এই অপ্রয়োজনীয় ব্যয় কমাতেই হবে।

এই ব্যয় সঙ্কোচনের প্রক্রিয়ায় প্রথমেই কোপ পড়ল কৃষি উৎপাদনে একান্ত প্রয়োজনীয় উপকরণ যেমন বিদ্যুৎ-সার-সেচ-বীজ-কৃষিঋণ ইত্যাদি খাতে সরকারি ভরতুকির উপর। বলা হল, এই ভরতুকি মূলত উপকরণের কারবারি আর বড় চাষিকেই অহেতুক সুবিধে দিয়ে অতিরিক্ত উৎপাদনে উৎসাহিত করে। উল্টোদিকে, ছোট চাষি এর থেকে খুব একটা লাভবান হন না, কারণ ওই সব উপকরণ তিনি খুব কমই ব্যবহার করেন। অন্যদিকে, এও বলা হল যে, একটা কি দুটো 'বাজারি' ফসলের অতি উৎপাদনের কারণে প্রাকৃতিক সম্পদের দ্রুত ক্ষয় হয় এবং শস্য-বৈচিত্রের ভারসাম্যও নষ্ট হয়। অতএব, সরকারের এই ব্যয় সব দিক থেকেই ক্ষতিকর। তাই, চাষের ওই সব উপকরণ চাষিকে খোলাবাজার থেকেই সংগ্রহ করতে হবে, যাতে 'বাজারি' প্রতিযোগিতার চাপে চাষি উপকরণের সঠিক (efficient) ব্যবহারে বাধ্য হয়। সরকারি ব্যয়ের এই সঙ্কোচন চাষিকে উপকরণ ব্যবহারে কতটা দক্ষ করে তুলল, তা তর্কের বিষয় হলেও এ নিয়ে কোনও তর্ক নেই যে, এই নীতি সমস্ত উপকরণের দামই বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। ফলে, চাষের খরচ মেটানো চাষির—বিশেষত ছোট ও মাঝারি চাষির নিজস্ব ক্ষমতায় আর সম্ভব হচ্ছে না। তাই মহাজনী ঋণের মাথাপিছু পরিমাণ ক্রমাগত বাড়ছে সারা দেশ জুড়ে!

অন্য দিকে, সরকারি ব্যয় কমাতে 'ন্যূনতম সহায়ক দামে' ফসল সংগ্রহ ও গণবণ্টন ব্যবস্থার মাধ্যমে তার বিতরণ—এই গুরুত্বপূর্ণ নীতি থেকে সরকার ক্রমশ নিজেকে সরিয়ে নিতে থাকে। বলা হয়, কৃষিপণ্যের দাম বাজারেই ঠিক হবে। এর মধ্যে দিয়ে একটা প্রতিযোগিতার পরিবেশ তৈরি হবে, যা চাষিকে শস্যের গুণমান, পরিমাণ ইত্যাদি বজায় রাখতে বাধ্য করবে। অর্থাৎ, বাজারই বলে দেবে কী কী ফসল কতটা পরিমাণে তৈরি করা দরকার এবং তার কী দাম হতে পারে। ফলে, অতিরিক্ত জোগানের সমস্যাও মিটবে।

আবার এই প্রতিযোগিতার যুক্তিতেই বিশ্ব-বাণিজ্য সংস্থার নিয়মানুসারে আমদানি-রফতানিকে ধীরে ধীরে সমস্ত ধরনের নিয়ন্ত্রণের বাইরে আনা হতে থাকে। অন্য দিকে, দেশের ভিতরও কৃষিপণ্যের চলাচলে প্রায় সমস্ত নিয়ন্ত্রণই তুলে নেওয়া হয়। একটা সার্বিক বাজার গড়ে তোলাই এ সবের লক্ষ্য।

সরকারি ব্যয়-সঙ্কোচন ও নিয়ন্ত্রণ শিথিল হওয়ায় প্রাথমিকভাবে কৃষকের আর বাজারের নিশ্চয়তা রইল না। বাজারের চাহিদামতো শস্য চাষ তাৎক্ষণিক লাভ দিলেও আখেরে চাষি বাজারের খামখেয়ালিপনার শিকার হয়ে পড়তে লাগল। এর উপর আবার অবাধ নীতির কারণে সস্তা কৃষিপণ্যের আমদানি দেশি ফসলের দাম ভীষণভাবে কমিয়ে দিল। উন্নত দেশের বিপুল পরিমাণ ভরতুকির কারণে আন্তর্জাতিক বাজারে ওই সব কৃষিপণ্যের দাম খুব কম। মুক্ত-বাণিজ্যের সুযোগে ওই ফসলই দেশের বাজারে ঢুকে পড়ল। এ ছাড়া সরকারি নিয়ন্ত্রণহীন অভ্যন্তরীণ বাজারে বড় আড়তদার আর বহুজাতিকের উপস্থিতি চাষিকে বাধ্য করল ওই সব সংস্থার সঙ্গে নানা রকম অসম চুক্তিতে যুক্ত হতে। এক কথায়, বাজারের নিয়ন্ত্রণহীন ওঠানামা চাষিকে দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করতে লাগল বছরের পর বছর।

এক দিকে চাষের খরচ বেড়ে চলা আর অন্যদিকে বাজারের অনিশ্চয়তা এ-দুয়ের মধ্যে পড়ে এক ব্যাপক অংশের কৃষক আজ দিশাহারা। কৃষির অবমূল্যায়ন এই বিশাল অংশের মানুষের অস্তিত্বের সঙ্কট ডেকে আনছে।

(লেখক বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি ও রাষ্ট্রনীতি বিভাগের অধ্যাপক)

দেশ-কাল

উৎপাদনে ঘাটতি নেই, অথচ খাদ্যশস্যের দেশজোড়া অনটন কেন

সৌম্য চক্রবর্তী

কয়েকটা খণ্ডচিত্র দিয়ে শুরু করা যাক। চিত্র (১) : বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া সহ বিভিন্ন জেলার হাজার কয়েক বন্যা-দুর্গত মানুষের দুর্ভোগ বাড়িয়েছে রেশনে গমের অমিল। আসলে, পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সব জেলাতেই সমস্যাটা কম-বেশি অনুভূত হচ্ছে। চিত্র (২) : এ-মুহূর্তে সারা দেশে অভূতপূর্ব খাদ্যসঙ্কটের জেরে ব্যাপক মূল্যবৃদ্ধি একটা বড় সমস্যা হয়ে দেখা দিয়েছে। চিত্র (৩) : সরকার বাধ্য হয়েছে গম-ডাল-চিনির অবাধ আমদানির অনুমতি দিতে। শুধু তাই নয়, এসব রফতানির উপরেও নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছে, যা 'মুক্ত-বাণিজ্যের দুনিয়া'য় একরকম উল্টো পথে চলতে বাধ্য হওয়া। চিত্র (৪) : গত ২৮ জুলাই বিরোধীপক্ষ এমনকী, সরকার পক্ষের কোনও কোনও দল নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি আর গণবণ্টন ব্যবস্থা ভেঙে পড়ার অভিযোগে লোকসভায় জোরালো প্রতিবাদ জানিয়েছে।

সব দেখে-শুনে মনে হচ্ছে যেন হঠাৎই হুড়মুড় করে সমস্যাটা ঘাড়ের উপর এসে পড়েছে। কিন্তু সত্যিই কি তাই? না কি একটু একটু করে তৈরি করা ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন তার ভয়ঙ্কর স্বরূপ প্রকাশ করছে! গত কয়েক বছরে খাদশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধির হার কমেছে ঠিকই কিন্তু তা কোনও বড়-রকমের হেরফের নয়। তা হলে এমন ঘটনা ঘটল কেন?

আসলে গত বেশ কয়েক বছর ধরে সরকারি নীতির কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন এই অবস্থা তৈরি করেছে। খাদ্যশস্যের বাজারের উপর থেকে সমস্তরকম নিয়ন্ত্রণ ব্যাপকভাবে কমিয়ে আনাই এই নীতি পরিবর্তনের মূল কথা। আর বাজারের উপর এই নির্ভরতার মূল যুক্তি তো সেই মুক্ত প্রতিযোগিতার মাধ্যমে ভারতীয় কৃষির আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত হওয়া। সে কারণে দেশীয় বাজারকে নিয়ন্ত্রণ-মুক্ত করা এবং তাকে আন্তর্জাতিক বাজারের সঙ্গে সংযুক্ত করা চলতে থাকল অত্যন্ত দ্রুতবেগে।

বলা হল যে, কৃষিপণ্যের বাজারের উপর সরকারি নিয়ন্ত্রণ বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা সৃষ্টি করছে। প্রথমত, সরকারি আনুকূল্যের কারণে এবং বিশেষ প্রযুক্তির সহায়তায় কয়েকটা মাত্র ফসল অতিরিক্ত গুরুত্ব পেয়েছে। একদিকে যেমন ভারসাম্যহীনভাবে ওই কয়েকটা ফসলের জোগান বাজারের বর্তমান চাহিদাকে ছাড়িয়ে গিয়েছে, অন্যদিকে আবার সরকারি ঘেরাটোপে প্রতিযোগিতার অভাবে উৎপাদন যথেষ্ট দক্ষতার সঙ্গে হচ্ছে না। উপরন্তু এই সুযোগ একমাত্র বড় চাষিরাই পাচ্ছেন সরকারের কাছাকাছি থাকার কারণে। তাই একদিকে যেমন নতুন বাজার খোঁজা দরকার অন্যদিকে তেমনই উৎপাদন দক্ষতা বাড়াতে হবে।

দ্বিতীয়, যে সমস্যার উল্লেখ বার বার হতে থাকল তা হল সরকারের অর্থাভাব। মাত্রাতিরিক্ত জোগানের চাপে সরকারকে বিপুল পরিমাণ ভরতুকি দিয়ে ফসল সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করতে হয় যাতে সেই ফসলের দাম না পড়ে। কিন্তু এভাবে বছরের পর বছর ভর্তুকি দেওয়া আর সম্ভব নয়। বলা হল, এ একরকম অপচয়, আর সরকারের এই ব্যয় না কমলে কৃষি বা শিল্পের জন্য অতিপ্রয়োজনীয় পরিকাঠামো উন্নয়নে সরকারি বিনিয়োগ বাড়বে কীভাবে?

তাই জোর কদমে শুরু হল বাজারের খোঁজ। দেশের অভ্যন্তরীণ কৃষিপণ্যের বাজারকে নিয়ন্ত্রণমুক্ত করা হল যাতে তা খাদ্যশস্যের তথাকথিত বাড়তি জোগানের দায়িত্ব নিতে পারে। ফসল সংগ্রহ, তার সংরক্ষণ ও বিপণন সবই করবে বাজার। এতে সরকারের বোঝা যেমন কমবে তেমনই আবার বাজারের প্রতিযোগিতার চাপে দক্ষতা বাড়াতে চাষি বাধ্য হবেন। তাছাড়া ফসলের দাম নিয়েও আর ভাবতে হবে না। ছোট-বড় সব চাষিই বাজারের মাধ্যমে ফসলের

একরকম অপচয়, আর সরকারের এই ব্যয় না কমলে কৃষি বা শিল্পের জন্য অতিপ্রয়োজনীয় পরিকাঠামো উন্নয়নে সরকারি বিনিয়োগ বাড়বে কীভাবে?

তাই জোর কদমে শুরু হল বাজারের খোঁজ। দেশের অভ্যন্তরীণ কৃষিপণ্যের বাজারকে নিয়ন্ত্রণমুক্ত করা হল যাতে তা খাদ্যশস্যের তথাকথিত বাড়তি জোগানের দায়িত্ব নিতে পারে। ফসল সংগ্রহ, তার সংরক্ষণ ও বিপণন সবই করবে বাজার। এতে সরকারের বোঝা যেমন কমবে তেমনই আবার বাজারের প্রতিযোগিতার চাপে দক্ষতা বাড়াতে চাষি বাধ্য হবেন। তাছাড়া ফসলের দাম নিয়েও আর ভাবতে হবে না। ছোট-বড় সব চাষিই বাজারের মাধ্যমে ফসলের উপযুক্ত দাম পাবেন। বলা হল, সরকারি বণ্টন ব্যবস্থার অপূর্ণতাও এই প্রক্রিয়ায় অনেকটা মেটানো সম্ভব। সরকারি দুর্নীতি ও গাফিলতির কারণে খাদ্যশস্যের যে বিপুল অপব্যবহার ও অপচয় হয় কিংবা চাহিদা থাকা সত্ত্বেও ঠিকমতো জোগান থাকে না, এসব সমস্যা বাজারের নজরদারিতে মিটবে।

অন্যদিকে, মুক্ত বাণিজ্যের দুনিয়ায় খাদ্যশস্যের রফতানির সম্ভাবনাকে বিরাটভাবে হাজির করা হল। বেশ কিছু খাদ্যশস্যে আমাদের তুলনামূলকভাবে সুবিধাজনক অবস্থান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে, এমনটাই দাবি করা হল। ওইসব শস্যের বাড়তি জোগানের সমস্যা যেমন রফতানির মাধ্যমে মেটানো সম্ভব আর এভাবে যেমন দেশের আয় বাড়ানো যেতে পারে, অন্যদিকে তেমনই এই প্রক্রিয়া অমূল্য বিদেশি মুদ্রা পেতে সাহায্য করবে। এসব যুক্তিতেই রফতানিকে প্রায় সমস্ত ধরনের নিয়ন্ত্রণের বাইরে আনা হতে থাকে। এইসব পরিবর্তন ভারতীয় কৃষিকে হঠাৎ করে কতগুলো বিপদের সামনে এনে ফেলল।

প্রথমত, গত বছরের শেষেই সরকারের ভাঁড়ারে টান পড়তে শুরু করে। ২০০২-এর ৬৪৮ লাখ টন মজুত খাদ্যশস্যের জায়গায় ২০০৫-এর শেষেই তা দাঁড়িয়েছিল মাত্র ১৫১ লাখ টনে, যা ন্যূনতম প্রয়োজনের থেকে ১০ লাখ টন কম! এই অবস্থা বর্তমান সঙ্কটের আভাসই দিচ্ছে না কি? সরকারের এই সঙ্কোচন খাদ্যশস্যে স্বনির্ভরতার সম্পূর্ণ পরিপন্থী!

একদিকে, যেমন সরকার নিজেই নিজের সঙ্কোচন ঘটিয়েছে, অন্যদিকে খাদ্যশস্য সংগ্রহকারী বেসরকারি সংস্থাগুলোর উপর সরকারের কোনও নিয়ন্ত্রণ না থাকায় চাষিদের কাছ থেকে সিংহভাগ খাদ্যশস্য বেসরকারি সংস্থাগুলো বেশি দামে কিনে নিয়েছে। এভাবে প্রায় আশি শতাংশ ফসল অধিগ্রহণ করে ফেলেছে বেসরকারি সংস্থাগুলো। আসলে বিদেশের বাজারে তুলনামূলকভাবে ভাল দাম পাওয়ায় এই ফসলের বিরাট অংশ রফতানি হয়ে গিয়েছে। বেসরকারি সংস্থা কী দামে কতটা ফসল সংগ্রহ করতে পারবে বা কোথায় তা বিক্রি হবে সে সবের উপর কোনও বাধানিষেধ না থাকায় যেখানে বেশি দাম পাওয়া যাবে বাজারের নিয়মে সেখানেই ফসল চলে যাবে—এটাই অবশ্যম্ভাবী। আর এভাবেই তো মুক্ত-বাজার প্রতিযোগিতা তৈরি করে পণ্যের উৎপাদন থেকে বিপণন অবধি প্রতিটি স্তরের দক্ষতা বাড়ায়।

কিন্তু এই প্রক্রিয়াই তৈরি করেছে তীব্র খাদ্যসঙ্কট। না দেশের বাজারে না সরকারের ভাঁড়ারে, কোথাও-ই খাদ্যশস্যের যথেষ্ট জোগান নেই। তথাকথিত অতিরিক্ত জোগানের সমস্যা মেটাতে গিয়ে জোগানের ঘাটতি তৈরি করা হল। আর সবচেয়ে অদ্ভুত-অযৌক্তিক ঘটনা, এরপর সরকার আবার বিদেশের বাজার থেকেই ভাল গম-চিনির আমদানি অবধি করতে বাধ্য হয়েছে অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি ঠেকাতে। অথচ এই আমদানির জন্য দেশের তুলনায় বেশি দাম দিতে হবে কারণ বিশ্ববাজারে এ-মুহূর্তে এসব পণ্যের দাম বেশি।

এছাড়া আরও একটা সমস্যা আছে। সরকারি নিয়ন্ত্রণের অভাবে বড় সংস্থাগুলি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কৃষিপণ্যের অভ্যন্তরীণ বাজার নিয়ন্ত্রণ করতে শুরু করায় সমস্যা বেড়েছে। ফসল কাটার পর কম দামে ফসল সংগ্রহ করে এরা মজুত করে রেখেছে, এটাই অভিযোগ। এদের হিসেবটাও সোজা, পরে দাম বাড়লে ফসল বাজারে ছেড়ে বাড়তি মুনাফা করা।

পণ্যের বাজারের কাছে খাদ্যসঙ্কট, দেশের খাদ্য-নিরাপত্তা বা খাদ্যের প্রয়োজন এসব কোনওই মাহাত্ম্য রাখে না। আসলে বাজারের কাছে খাদ্যশস্য শুধুমাত্রই একটা পণ্য যার কারবারির একমাত্র লক্ষ্যই ব্যক্তিগত মুনাফা অর্জন। সেখানে দেশ বা মানুষের প্রয়োজন—এসব প্রশ্ন অবান্তর। কিন্তু শুধু সমাজের জন্যই নয়, রাষ্ট্রকে নিজের অস্তিত্বের প্রয়োজনেও এসব সমস্যাকে গুরুত্ব দিতেই হয়।

ছবি : শান্তনু দে

: মুদ্রিত এবং প্রকাশিত। ফোন : ২২১২-৮৪০০ - ০৫ ফ্যাক্স : ২২১২-৬০৩৬/৩১
ফোন : (০৩৫৩) ২৬৪২২০৪ টেলিফ্যাক্স (০৩৫৩) ২৬৪২৬৪৫
:১) ২২১০৯৯৪
: (০৩২৪১) ২৫৭৩০৩, ২৫৬২০১

lkata - 700 072, from B. L. Publications Pvt. Ltd. 20, Prafulla Sarkar Street,
by him from City Plaza Complex 2nd floor, Sevak Road, Siliguri - 734401.
ublished by him.
a. Tel : (03241) 257303, 256201

দরিদ্রর খাদ্য নিরাপত্তার জন্য শস্য-চাষে জোর দেওয়া জরুরি

সৌম্য চক্রবর্তী

ভারতীয় কৃষি এ মুহূর্তে কতকগুলি জটিল সমস্যার সম্মুখীন।

সবুজ বিপ্লব তার গতি হারিয়েছে, প্রায় সমস্ত ফসলেই—বিশেষত খাদ্যশস্যে বিঘাপ্রতি উৎপাদন বৃদ্ধির হার ক্রমশ কমছে। মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহারে জলস্তর নেমে যাওয়া, অতিরিক্ত রাসায়নিক সার ওষুধ প্রয়োগে জমির উর্বরা শক্তি হ্রাস—এসব সবুজ বিপ্লবেরই কুফল। তাই উৎপাদন ধরে রাখতে চাষিকে আরও বেশি বেশি করে খরচ করতে হচ্ছে। আর এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে উৎপাদনের কাঁচামাল ও উপকরণের মূল্যবৃদ্ধি। সরকারের ভূমিকার সঙ্কোচনই এর মূল কারণ। ভরতুকি হ্রাস আর কাঁচামাল ও উপকরণের বাজারকে সরকারি নিয়ন্ত্রণ মুক্ত করা—এসব করা হচ্ছে কৃষি উৎপাদনে 'দক্ষতা' বাড়ানোর যুক্তিতে। কিন্তু বাজারের চাপে সার-বীজ-বিদ্যুতের দাম বাড়ছে। আর সব মিলিয়ে চাষের খরচ বাড়ছে হু হু করে।

অন্যদিকে, এক বিরাট সমস্যা হিসাবে দেখা দিয়েছে কৃষিপণ্যের বাজারের খামখেয়ালিপনা। সরকারি সহায়তার সঙ্কোচনের কারণে চাষিকে বেশি বেশি করে নির্ভর করতে হচ্ছে খোলা বাজারের উপর। আর সেখানেই নানারকম সমস্যা তৈরি হচ্ছে। প্রথমত, ফসল বিক্রির নিশ্চয়তা থাকছে না। বাজারে চাহিদা থাকলে ফসল বিক্রি হচ্ছে, নচেৎ তা মাঠে বা গুদামঘরে পচছে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই চাষি ফসলের ন্যায্য দাম পাচ্ছেন না। খাদ্যশস্যের আপাত অতিরিক্ত যোগানের সুযোগ নিচ্ছে বড় আড়তদের ব্যবসায়ীরা। অল্প দামে চাষির থেকে ফসল কিনে তারা তা হয় মজুত করছে না হয় রফতানি করছে বাড়তি মুনাফার লক্ষ্যে।

সরকারের তরফ থেকে অনেক সময়েই দায়িত্ব ঝেড়ে ফেলা হচ্ছে এই বলে যে, মাত্রাতিরিক্ত উৎপাদনই চাষির মূল সমস্যা। দীর্ঘদিনের সরকারি সহায়তার সুযোগে সারা দেশেই মাত্র কয়েকটা ফসলের চাষ বাড়-বাড়ন্ত। নানারকম সরকারি ভরতুকির কারণে এসব ফসলের মাত্রাতিরিক্ত চাষ হয়েছে। এই সহায়তা চালিয়ে যাওয়া যেমন সরকারের পক্ষে ক্ষতিকর, তেমনই এই চাষ চাষির পক্ষেও আর লাভজনক নয়। কয়েকটা মাত্র ফসলের 'বাজারি' চাহিদার থেকে বেশি পরিমাণ চাষ কোনওভাবেই সমর্থনযোগ্য নয়। বরং চাষিকে বুঝতে হবে বাজারের নির্দেশ। সেই নির্দেশ মেনেই ফসলের 'বৈচিত্রায়ণ' (diversification) একান্ত প্রয়োজন।

এই বাজার শুধু দেশের 'খোলা বাজার'-ই নয়, আন্তর্জাতিক বাজারও বটে। অর্থাৎ বিশ্বায়িত বাজার-ই এখন বলে দেবে চাষির কোনও ফসল কতটা পরিমাণে চাষ করা উচিত। বিশ্ববাজারে বিভিন্ন ফসলের দামের ওঠানামাই চাষিকে ওইসব ইঙ্গিত দেবে। এ বিষয়ে চাষিকে সহায়তা করতে পারে কৃষিপণ্যের প্রক্রিয়াকরণ ও বিপণনে বিনিয়োগকারী দেশি-বিদেশি শিল্পগোষ্ঠী ও ব্যবসায়ীরা। এভাবেই আসছে 'চুক্তি চাষ—বৈচিত্রায়ণ ও প্রক্রিয়াকরণ'-এর ফর্মুলা। বলা হচ্ছে, এভাবে চাষ ও চাষির দক্ষতা বাড়বে, আর বাজারের সমস্যাও মিটবে।

এভাবেই আসছে কৃষিতে বৈচিত্রায়ণের যুক্তি। বলা হচ্ছে, ধান-গম-জোয়ার জাতীয় দানা শস্যের ফলন কমিয়ে চাষির অন্য ফসল চাষে মনোযোগী হওয়া উচিত। ফল-ফুল-সবজি ও মাছ চাষ গুরুত্বপূর্ণ বিকল্প হতে পারে। তা ছাড়া পশু-পাখি পালনও অনেক বেশি লাভজনক। এমনকী, মোটা দানার ফসলের বদলে দামি দানাশস্য যেমন বাসমতী চাষ করা উচিত। শুধুমাত্র দেশীয় বাজারই নয়, বিদেশের বাজারে রফতানির সুযোগ এ সব উৎপাদনের বড় সহায়ক হতে পারে। এভাবে কৃষিতে আয়বৃদ্ধি সম্ভব। তা ছাড়া এই চাষ শ্রমনিবিড় হওয়ায় কর্মসংস্থানের সুযোগও বাড়বে। আরও বলা হল যে, এই বৈচিত্রায়ণ 'প্রক্রিয়াকরণ' শিল্পের বিপুল সম্ভাবনা তৈরি করবে। শুধু বিদেশের বাজারেই নয় দেশের বাজারেও এখন প্রক্রিয়াজাত ফল, সবজি, মাছ, মাংস ইত্যাদির বিপুল চাহিদা তৈরি হচ্ছে। ফলে শুধুমাত্র চাষির বাজারের সমস্যাই মিটবে না, গ্রামীণ প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের ব্যাপক প্রসার গ্রামীণ কর্মসংস্থান ও আয় বাড়াবে।

এভাবে যে উজ্জ্বল ছবি আমাদের সামনে তুলে ধরা হচ্ছে, ভেবে দেখা দরকার তা সত্যিই কতটা নির্ভরযোগ্য। আসুন, এই সুযোগে কয়েকটা প্রশ্নকে আমরা একটু ঝালিয়ে নিই। বলা হচ্ছে, দেশের অভ্যন্তরীণ বাজারে সাধারণ দানাশস্য যেমন ধান-গম ইত্যাদির চাহিদা কমে যাচ্ছে। দেখা যাচ্ছে, এইসব খাদ্যশস্যের মাথাপিছু ভোগ কমছে নয়'-এর দশক জুড়েই। এর দুটো কারণ থাকতে পারে। একটা মত হল অর্থনৈতিক উন্নতির সঙ্গে মানুষের আয় বাড়ায় জনগণের এক ব্যাপক অংশ চাল, গম, জোয়ার ইত্যাদির ভোগ কমিয়ে সবজি ফল ইত্যাদির ব্যবহার বাড়াচ্ছে। অর্থাৎ অর্থনৈতিক উন্নতির কারণেই ধান, গম, জোয়ার-এর চাহিদা কমছে দেশ জুড়ে। অন্যদিকে, সবজি ফল, মাছ, ডিম-এর চাহিদা বাড়ছে। বলা হচ্ছে, চাহিদার এই পরিবর্তনের কারণে কৃষিরও বৈচিত্রায়ণ প্রয়োজন। এটা হতেই পারে যে জনগণের একটা অংশের আয় বাড়ায় ধান, গম ইত্যাদি প্রচলিত ফসলের অবিক্রিত উদ্বৃত্ত তৈরি হচ্ছে। কিন্তু দেশের জনসংখ্যার বিপুল অংশের দারিদ্র, অনাহার, অর্ধাহার অপুষ্টি অন্য কথাই বলে। গ্রাম, শহরের ব্যাপক অংশ মানুষের ক্রয়ক্ষমতার অভাবই সম্ভবত উদ্বৃত্ত শস্য সমস্যার মূল উৎস। দেশের মোট উৎপাদিত খাদ্যশস্য সকলের মধ্যে প্রয়োজন অনুসারে ভাগ করে দিলে কি সত্যিই উদ্বৃত্ত ফসল থাকবে? এটা একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন! এ মুহূর্তে দানাশস্যের দৈনিক মাথাপিছু ভোগ (৪২০ গ্রাম) প্রয়োজনের তুলনায় (৪৭৭ গ্রাম) অনেক কম যা ব্যাপক অনাহার ও অপুষ্টিরই প্রমাণ। সরকারি হিসাবেই ২৬ শতাংশ মানুষ দারিদ্র সীমার নিচে। আর বেশির ভাগ রাজ্যেই দৈনিক মাথাপিছু ক্যালরি গ্রহণ কমছে। এসবের পরেও কি বলা উচিত যে ধান গমের উৎপাদন প্রয়োজনাতিরিক্ত! গবেষণা বলছে, সাধারণ মানুষের প্রয়োজনের কথা ভাবলে এসব শস্যের চাষ ভীষণ দরকারি। অবশ্য বাজারি মুনাফা বা বিদেশি মুদ্রা লাভের যুক্তি অন্য কথা বলবে।

দেশের এই সার্বিক খাদ্য নিরাপত্তার বিষয়টা যেমন ভীষণই গুরুত্বপূর্ণ, তেমনই প্রয়োজন প্রতিটা পরিবারের খাদ্য নিরাপত্তার প্রশ্নটাকে যাচাই করে নেওয়া। মনে রাখা দরকার, এ মুহূর্তে সারা দেশের মোট চাষযোগ্য জমির ৪০ শতাংশের উপর ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষির মালিকানাভুক্ত। যার অর্থ, এক বিশাল অংশ কৃষকের পরিবার পিছু জমির পরিমাণ খুবই কম। এই অল্প জমির অনেকটাই কাজে লাগে সারা বছরের খাদ্য, যেমন ধান, গম তৈরি করতে। আসলে একটুকরো জমি মানে পরিবারের খাদ্য নিরাপত্তা। মুনাফার লোভ দেখিয়ে এদেরকে ফুল, ফল, সবজি দামি দানাশস্য কিংবা অর্থকরী ফসল চাষে টেনে নিয়ে গেলে তার ফল হতে পারে মারাত্মক। একবার ফলন মার খেলে বা বাজার বিশ্বাসঘাতকতা করলে এই সব ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষির বেঁচে থাকাই যে অসম্ভব হয়ে পড়বে। আসলে এই সব চাষ একেবারেই বাজারমুখী। তাই দেশীয় বা আন্তর্জাতিক বাজারের সামান্য খামখেয়ালীপনা এই বিশাল অংশ মানুষের খাদ্য নিরাপত্তাকে সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত করতে পারে। একটুকরো জমি নিয়ে ঘুরে দাঁড়ানোর ক্ষমতা এদের থাকে না। তাই বাজারের জন্য উৎপাদন তাৎক্ষণিক লাভ দিলেও তা খুবই ক্ষণস্থায়ী হতে পারে। একদিকে যেমন নিজেদের খাদ্য উৎপাদনের সুযোগ আর নিজেদের হাতে থাকে না অন্যদিকে আবার বাজার থেকে তা কিনে খাওয়াও কঠিন হতে পড়ে। প্রথমত ধান, গম, জোয়ার, বাজরার চাষ সার্বিকভাবে কমে গিয়ে ব্যাপক মূল্যবৃদ্ধি হতে পারে। আর নিয়ন্ত্রণহীন বাজার এই মূল্যবৃদ্ধিকে আকাশছোঁয়া করে তুলতে পারে। অন্যদিকে ফল, সবজি, দামি দানাশস্য, বিশেষত প্রক্রিয়াজাত পণ্য ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষির ধরা ছোঁয়ার বাইরেই থেকে যায়। এ অবস্থায় চাষিকে নিজের তৈরি সবজি ইত্যাদি খেতে বলা হয় বটে তবে তা মারি আঁতোয়ানেতের কথাই মনে করায়! ফলে, ব্যাপক সংখ্যায় কৃষককে 'বৈচিত্রায়ণ-প্রক্রিয়াকরণ-চুক্তি-চাষ' এই শৃঙ্খলে যুক্ত করার আগে গভীরভাবে পর্যালোচনা করা দরকার।

শুধু প্রান্তিক বা ক্ষুদ্র চাষির খাদ্য নিরাপত্তাই নয়, এর সঙ্গে যুক্ত বিরাট সংখ্যক দরিদ্র মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টির প্রশ্ন। বৈচিত্রায়ণ ও প্রক্রিয়াকরণে যেমন মূল খাদ্যশস্যের উৎপাদন কমাতে পারে, এর ফলে যেমন মূল্যবৃদ্ধি হতে পারে আকাশছোঁয়া, অন্যদিকে আবার ফল, শাক-সবজি, মাছ, মাংস এসব সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের ধরা ছোঁয়ার বাইরে চলে যেতে পারে। প্রক্রিয়াকরণের পর এসব পণ্যের দাম যা হয় তা সাধারণের সাধ্যাতীত। ওই প্রক্রিয়াজাত পণ্যের মূল ভোক্তা তো দেশের বা বিদেশের ধনী সম্প্রদায়। আর এটা যে অসম্ভব নয় তা বাসমতী বা অন্যান্য ফল সবজির অপ্রতুলতাই প্রমাণ করে। বৈচিত্রায়ণ প্রক্রিয়াকরণ এই পদ্ধতিতে স্থিতিশীল দীর্ঘস্থায়ী ও ব্যাপক অংশের আয় বৃদ্ধি ঘটাতে প্রয়োজন বিশাল বিনিয়োগ। চাই সংরক্ষণ ব্যবস্থার ব্যাপক উন্নতি। চাই উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা পরিকল্পিত বাজার। চাই উন্নত প্রযুক্তি। প্রশ্ন হল, বেসরকারি পুঁজির উপর নির্ভর করে কি এত বড় ফাটকা খেলা যায়! যদি বিশ্ববাজার কখনও বিমুখ হয়, হঠাৎ যদি দাম পড়ে যায়, সরকার তা সামাল দিতে পারবে তো! সার্বিক খাদ্য নিরাপত্তা আর ওই বৈচিত্রায়ণ প্রক্রিয়ার অংশ নেওয়া অসংখ্য ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষির খাদ্য নিরাপত্তার প্রশ্নটা আমরা যেন ভুলে না যাই!

আসলে সত্যিই কি এই বৈচিত্রায়ণ-প্রক্রিয়াকরণ ভারতীয় কৃষিকে অদূর ভবিষ্যতে দুর্দশা মুক্ত করতে পারবে? তথ্য বলছে, ফল-ফুল-সবজির আন্তর্জাতিক বাজারে ভারতের ভাগ এক শতাংশেরও কম, আর দেশের ৫০ শতাংশ প্রক্রিয়াকরণ ক্ষমতা তো অব্যবহৃতই পড়ে আছে। আসলে ভারতবাসী না কি টাটকা ফল, সবজি, মাছ ডিম খেতেই বেশি পছন্দ করে। আর সে সব বিদেশে নাই বা পাচার করলাম।

লেখক : অধ্যাপক, অর্থনীতি ও রাষ্ট্রনীতি বিভাগ, বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন

চুক্তিচাষ : একদিকে ঋণের জাল অন্যদিকে নিরাপত্তাহীনতা

সৌম্য চক্রবর্তী

গত দেড়-দুই দশকে অত্যন্ত দ্রুত ঘটে যাওয়া বেশ কিছু মৌলিক পরিবর্তনের ধাক্কায় 'ভুমি-সংস্কার', 'সবুজ-বিপ্লব' আর সরকারি বদান্যতায় ভরসা রাখা ভারতীয় কৃষি ও কৃষক হঠাৎ করেই কেমন যেন দিশাহারা হয়ে পড়েছে।

পরিবার ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে ভাঙছে কৃষি-জোত। ভুমি-সংস্কারের লাভটুকুও ভাগ হয়ে যাচ্ছে। দেশের মোট চাষযোগ্য জমির ৪০ শতাংশের উপর ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষির হাতে। অন্যদিকে, সবুজ-বিপ্লবের মারাত্মক কুফলগুলো প্রকট হয়ে উঠছে। বিঘা-প্রতি উৎপাদন বৃদ্ধির হার কমছে হু হু করে। ফলে উৎপাদন ধরে রাখতে সার-জল-ওষুধের ব্যবহার বাড়াতে হচ্ছে ক্রমাগত। আর এই অবস্থায় 'দক্ষতা' অর্জনের যুক্তিতে কৃষি-উপকরণের উপর থেকে সরকারি ভরতুকি তুলে নেওয়ায় সমস্যা বাড়ছে বহুগুণ। একদিকে, চাষের খরচ বাড়ছে লাগাম ছাড়া, অন্যদিকে, কৃষিপণ্যের বিক্রিতে সরকারি সহায়তার সঙ্কোচন হচ্ছে ওই একই দক্ষতার যুক্তিতে। সব মিলিয়ে, চাষিকে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হচ্ছে 'বিশ্বায়িত' বাজারের ওঠা-পড়ার সামনে।

ছবি : শান্তনু দে

বলা হচ্ছে, এই ট্র্যাপিজের খেলায় সেই জিতবে যে 'মুক্ত' বাজারের চলাফেরা ঠিক সময়ে ঠিকমতো বুঝতে পারবে। আর সেখানেই তো দক্ষতা। কোনও অত্যাচারী নীলকর সাহেবের ভয়ে নয়, চাষি যেন 'নৈর্ব্যক্তিক' বাজারের দক্ষতার/'প্রতিযোগিতা'র যুক্তিকে 'সত্য' মেনে নিয়ে-সে পথেই হাঁটে; এটাই যৌক্তিক (Rational)। কিন্তু একটা কথা বলে নেওয়া ভাল। এই যুক্তি-প্রবাহ বাজারের পিছনে ক্রিয়াশীল অর্থনৈতিক/রাজনৈতিক/সামাজিক/সাংস্কৃতিক ক্ষমতার অস্তিত্ব ভুলে যাওয়ার—ভুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু আসল কথাটা হল এটাই যে, এই ক্ষমতার উপস্থিতিতে বাজার-ব্যবস্থা আর নৈর্ব্যক্তিক থাকে না। আর সে কারণেই বাজারের বাতলে দেওয়া সমাধান নিয়ে আলোচনার গুরুত্ব। যেমন গুরুত্বপূর্ণ এ-মুহূর্তে ভারতীয় কৃষি ও কৃষকের সমস্যার সমাধান হিসেবে উঠে আসা 'চুক্তিচাষ—বৈচিত্র্যায়ণ— প্রক্রিয়াকরণ'ও 'কৃষিপণ্যের খুচরো ব্যবসার শৃঙ্খল' বিষয়ে আলোচনা।

আজকের চাষির সমস্যার একটা বড় বিষয় বাজার, বিশেষত, ধান - গম - জোয়ার - বাজরা এসব সাধারণ/সস্তা দানাশস্যের চাহিদার অভাব। তবে পাটচাষি/ তুলো চাষিরাও এর বাইরে নয়। সমস্যার কারণ যা-ই হোক সমাধান হিসেবে হাজির হচ্ছে 'চুক্তিচাষ'। বলা হচ্ছে, চুক্তিচাষ শুধু চাহিদার সমস্যাই মেটাবে না কৃষি উৎপাদনের দিকেও যথেষ্ট নজর দেবে যাতে একটা সার্বিক দক্ষতা অর্জন করা যায়। আর তা হবে 'বিশ্বায়িত' বাজার-ব্যবস্থার সঙ্গে চাষি-কে যুক্ত করার মধ্যে দিয়ে। এই সংযুক্তিকরণের কাজটা—শেষ বিচারে—সেই সব বড় দেশি-বিদেশি সংস্থাই করবে যারা বাজারের 'প্রতিযোগিতা—উৎপাদনশীলতা-দক্ষতা'র যুক্তিটা বোঝে এবং অবশ্যই তার পিছনে কার্যকরি ক্ষমতার খেলায় অংশগ্রহণ করতে পারে। আর তাই এরাই পারে (বাজারের নির্দেশমতো) কৃষক-কে 'সঠিক' দিকে চালনা করতে।

কোন ফসল—কতটা এবং কোন সময়ের মধ্যে তৈরি করতে হবে, তা করতে গিয়ে কী কী উপকরণ-কাঁচামাল ও প্রযুক্তিগত জ্ঞান দরকার, ফসলের গুণমান কী হবে এবং সর্বোপরি ফসল কত দামে বিক্রি হবে এ-সব আগাম জানিয়ে চাষির সঙ্গে চুক্তি করবে ওই রকম বড় কোনও সংস্থা। সংস্থার নির্দেশমতো সব উপকরণ ইত্যাদি ব্যবহার করে সঠিক সময়ের মধ্যে সঠিক পরিমাণে ও সঠিক মানের ফসল পূর্বনির্দিষ্ট দামে চাষি সরবরাহ করবে ওই কোম্পানিকে। আর এভাবে চাষির বাজারের অভাব মিটবে, দক্ষতাও বাড়বে।

সমস্যা হল, এসব মানতে গেলে চাষিকে বিপুল পরিমাণ ঋণ নিতে হবে। কারণ, কোম্পানির চাহিদামতো উৎপাদন করতে দামি উপকরণ দরকার। খোলা বাজারে সেই ঋণ পাওয়া যে কোনও ছোট চাষির পক্ষে প্রায় অসম্ভব। বড় চাষিরাই তাই নিজের জোরে বা ঋণের সাহায্যে চুক্তিচাষের সুযোগ নিতে পারবে। তবে অনেক সময় কোম্পানি-ই ঋণ দেয়, যদিও ফলনের অনিশ্চয়তার কারণে ছোট চাষির ঋণের জালে জড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা প্রবল। শেষ পরিণতি, হয় জমি বিক্রি, নয়ত-বা কোম্পানির সঙ্গে অত্যন্ত ক্ষতিকর চুক্তি-শৃঙ্খলে আবদ্ধ হওয়া।

আসলে, চুক্তিচাষে বাজারের খানিকটা নিশ্চয়তা থাকলেও চাষের পুরো ঝুঁকিটাই চাষির ঘাড়ে বর্তায়। কৃষিপণ্যের বড় ব্যবসায়ী এ পদ্ধতিতে প্রায় কোনও ঝুঁকি না নিয়েই পণ্যের জোগান পেতে পারে। তার স্বল্প-মেয়াদি কিছু ঝুঁকি থাকলেও দীর্ঘকালীন ভিত্তিতে বড় সংখ্যক চাষিকে চুক্তিবদ্ধ করতে পারলে সমস্যা অনেকটাই কমে। কোনও এক-দু'জন চাষি কোনও কারণে চুক্তি রাখতে না পারলে বড় কোম্পানির কিছু এসে যায় না। অথচ, উল্টোদিকে, এ-অবস্থায় চাষির সর্বনাশ হয়।

অনেক সময় কৃষিপণ্যের ব্যবসায়ী অন্যান্য কোম্পানির সঙ্গে মিলে উৎপাদনের সমস্ত উপকরণ সরবরাহ, কৃষিপণ্য সংগ্রহ এবং তার প্রক্রিয়াকরণ ও বিপণন করে। এভাবে বড় কোম্পানিগুলো পুরো প্রক্রিয়ার ঝুঁকিটাকেই ভাগ করে নেয় নিজেদের মধ্যে। যদিও চাষির ঝুঁকি সামলানোর মতো কোনও সরকারি সাহায্য দূরস্থান কোনও বিমার ব্যবস্থাও নেই। অন্যদিকে, বড় সংস্থাগুলো একজোট হওয়ায় অসংগঠিত চাষির কাছে দ্বিতীয় কোনও পথ খোলা থাকে না।

এটা অনেক সময়ই দেখা যায় যে, কৃষিপণ্যের ব্যবসায়ী নানা অছিলায় চুক্তি ভেঙে ফসল কিনতে অস্বীকার করে। কিন্তু এতে বড় ব্যবসায়ীর ক্ষতি সামান্যই, কারণ কৃষিপণ্যের বাজারের নিয়ন্ত্রণ তো মাত্র কয়েকটা সংস্থারই হাতে। তাই, চুক্তিভঙ্গ হলেও চাষির কিছুই করার থাকে না। তাকে বারেবারেই ফিরে আসতে হয় ওইসব সংস্থারই কাছে। এটা তো আর তথাকথিত বাজারের 'লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড' নয়। ফলে চুক্তিভঙ্গ করেও বড় ব্যবসায়ী পার পেয়ে যায়।

বিশ্বায়িত বাজারের চাহিদা-মতো বড় কোম্পানির সঙ্গে অসংখ্য ছোট চাষির চুক্তি হয় কোনও বিশেষ ('বাজারি') ফসল চাষের জন্য। কিন্তু বাজারের দ্রুত পরিবর্তন পণ্য ব্যবসায়ীর চাহিদারও পরিবর্তন ঘটায়। অথচ ওই দ্রুততায় এক চাষ থেকে অন্য চাষে সরে আসা প্রায় অসম্ভব। ফলে বহু ক্ষেত্রেই চুক্তির পুনর্নবিকরণ হয় না। তখন চাষির না থাকে নতুন ফসলের বাজার, না থাকে পুরনো ফসলে ফিরে যাওয়ার ক্ষমতা। চুক্তিচাষের ধাক্কায় পুরনো কাঠামোটাই যে বদলে যায়।

চুক্তিচাষে বেশিরভাগ সময়েই চুক্তি হয় দামি কৃষিপণ্য উৎপাদনের লক্ষ্যে। কারণ, দামি চাল, ফল-সবজি ইত্যাদি প্রক্রিয়াকরণের পর বিক্রি করতে পারলে দেশে-বিদেশে তার বাজার-দর অনেক। তাই মুনাফার যুক্তিতে কৃষিপণ্য ব্যবসায়ীরা সব সময়েই চাষিকে ওই সব দামি ফসল চাষে উৎসাহ দেয় (অনেক সময় বাধ্যও করে)। চাষিও তাৎক্ষণিক লাভের আশায় ওই পথে পা-বাড়ায়। কিন্তু কোনও কারণে চুক্তিভঙ্গ হলে অসংখ্য ক্ষুদ্র চাষির অবস্থা হয় করুণ। ওই দামি ফসল (বিশেষত পচনশীল ফল-সবজি) সে না পারে দ্রুত খোলা বাজারে বেচতে, না পারে নিজে ব্যবহার করতে। ফলে, একদিকে যখন ঋণের জালে জড়িয়ে পড়ার ভয়, অন্যদিকে আবার ভয়ানক খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা। আর এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে সারা দেশের খাদ্য-নিরাপত্তার প্রশ্নটাও। কোটি কোটি দরিদ্র খেটে খাওয়া মানুষ তো আর ওই সব দামি ফসল খেয়ে বাঁচে না!

এভাবে ব্যক্তিগত মুনাফা—পুঁজির সঞ্চয়ন—বিদেশি মুদ্রা আয় কিংবা কৃষির তাৎক্ষণিক লাভের যুক্তিতে চুক্তিচাষ গুরুত্বপূর্ণ হলেও তা সার্বিক নিরাপত্তাহীনতা ডেকে আনে। 'খামার থেকে খুচরো বিপণন' এই পুরো প্রক্রিয়ায় বিশাল পুঁজির অনুপ্রবেশ চাষের সঙ্গে যুক্ত সমস্ত ধাপগুলোকে সুসংবদ্ধ করবে এটা যেমন ঠিক, কিন্তু এই সমস্ত ধাপে যুক্ত অসংখ্য অসংগঠিত মানুষের ভবিষ্যতে একটা বড় প্রশ্ন। যদি তারা পুঁজির আবর্তে যুক্ত হয় তা-ও এক কথা; কিন্তু বৃহৎ পুঁজি কি এই বিশাল সংখ্যক মানুষকে ধারণ করতে সক্ষম? আর পুঁজি কি তা চায়? সে-ক্ষেত্রে ওই লক্ষ লক্ষ মানুষের কী হবে? সবশেষে, 'চুক্তিচাষ-বৈচিত্র্যায়ণ - প্রক্রিয়াকরণ-বিপণন' পুঁজির এই সর্বব্যাপী প্রক্রিয়ায় কোটি কোটি কৃষি-শ্রমিকের স্থান কোথায়?

(লেখক অর্থনীতি ও রাষ্ট্রনীতি বিভাগের অধ্যাপক, বিশ্বভারতী শান্তিনিকেতন)

সরকারি ব্যয়, মুদ্রাস্ফীতি, মূল্যবৃদ্ধি

সমস্যাটা রাজনৈতিক

সৌম্য চক্রবর্তী

একটা দেশের অর্থনৈতিক প্রগতি ও উন্নয়নের সামনে মূল্যবৃদ্ধি অনেক সময়েই বড় বাধা হয়ে দাঁড়ায়। মোট জাতীয় উৎপাদন দ্রুত বাড়ানোর পরিকল্পনা মূল্যবৃদ্ধির চাপে ভেস্তে যেতে পারে। আর অসংখ্য সাধারণ মানুষের কাছে মূল্যবৃদ্ধি তো অভিশাপ, কুফল সহ্য করতে হয়, অথচ কিছুই করার থাকে না। সংগঠিত ক্ষেত্রে যা-ও বা মহার্ঘভাতার সুযোগ পাওয়া যেতে পারে, অসংগঠিত ক্ষেত্রে যুক্ত কোটি কোটি মানুষ একেবারেই অসহায়।

প্রশ্ন হল, মূল্যবৃদ্ধি হয় কেন? তলিয়ে দেখলে বোঝা যায় মূল্যবৃদ্ধির অনেক রকম আকার থাকতে পারে, অথচ বেশিরভাগ সময়েই অতিরিক্ত চাহিদাকেই মূল সমস্যা হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। প্রথমেই বলে নেওয়া ভাল এটা আসলে অর্ধ-সত্য।

অতিরিক্ত চাহিদার কারণে মূল্যবৃদ্ধি, এই যুক্তি-কাঠামোর ভিত্তি জোগানের অস্থিতিস্থাপকতা। কোনও কারণে চাহিদা বেড়ে চললেও জোগান যদি সমান তালে না বাড়তে পারে তবেই মূল্যবৃদ্ধি ঘটে। আসলে, চাহিদা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদনের উপকরণ-কাঁচামাল এসবের জোগান হিসাব মতো বাড়াতে হবে। এই হিসাব ঠিকমতো না মিললে উৎপাদন-আয়-কর্মসংস্থানতেমনভাবে বাড়বে না, বরং জিনিসপত্রের দাম বাড়তে থাকবে দ্রুত। ফলে সমস্যার মূল কেন্দ্র উৎপাদনের জোগান নয়, উপকরণ-কাঁচামাল এসবের জোগানের অভাব। আর উৎপাদন ক্ষেত্রগুলো যেহেতু পরস্পর পরস্পরের উপর নানাভাবে নির্ভরশীল সব উৎপাদন ক্ষেত্রেই হিসাবমতো উৎপাদন বাড়ানো জরুরি। তাই চাহিদা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে দেখতে হবে যাতে সব ক'টা উৎপাদন ক্ষেত্রেই উপকরণ ও কাঁচামালের যথেষ্ট জোগান থাকে। আর তা যেন সুলভে পাওয়া যায়।

ছবি : শান্তনু দে

অন্যভাবে বলা যায়, চাহিদা বাড়লেও যদি উৎপাদনের প্রকরণ-এর যথেষ্ট ও সুলভ জোগান থাকে এবং তা ব্যবহার করে যদি উৎপাদন যথেষ্ট বাড়ানো যায় তবে মূল্যবৃদ্ধি নয় বরং উৎপাদন বৃদ্ধিই হবে। আর তাই চাহিদা বাড়া মানে দাম বাড়বেই—এ-ধারণা ভুল। চাহিদা বাড়লে দাম না বেড়েই জাতীয় উৎপাদন আয় এসব বাড়তে পারে। তবে তা হতে গেলে পরিকল্পনা দরকার যাতে চাহিদা জোগানের হিসাবটা ঠিকমতো মেলে। সবটা বাজার ব্যবস্থার হাতে ছেড়ে দিলে—অভিজ্ঞতা বলছে—তা আর হওয়ার নয়।

এখন প্রশ্ন হল, চাহিদা বাড়ে কীভাবে? চাহিদার মোটামুটি চারটে উৎস-ভোগ ব্যয়, বিনিয়োগ, সরকারি ব্যয় ও রফতানি উদ্বৃত্ত। এই চারটের যে কোনও একটা বা কয়েকটা বাড়লে চাহিদা বাড়ে। বর্তমান সময়ে এদের মধ্যে সবচেয়ে আলোচিত উৎসটা অবশ্যই সরকারি ব্যয়। সরকারের এই ব্যয়ের একটা বড় সহায় তার টাকা ছাপানোর আইনানুগ ক্ষমতা। আর কারও এই ক্ষমতা নেই। সরকার টাকা ছাপিয়ে নিজের ব্যয়ের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান করতে পারে। আর এই ক্ষমতাই বর্তমানে সবচেয়ে বেশি সমালোচিত। এই সমালোচনার একটা বড় দিক এটাই যে, সরকার টাকা ছাপিয়ে তার রাজস্ব মারফত আয়ের থেকেও বেশি খরচ মেটালে মুদ্রাস্ফীতি হয়। আর মুদ্রাস্ফীতি মানে তো মূল্যবৃদ্ধি। কিন্তু সত্যিই কি তাই? মুদ্রাস্ফীতি চাহিদা বাড়ায় এটা ঠিক, কিন্তু উপযুক্ত জোগান থাকলে দাম তো বাড়ার কথা নয়। অর্থাৎ, মুদ্রাস্ফীতি মানেই মূল্যবৃদ্ধি, এটা ঠিক নয়। মুদ্রাস্ফীতি আর মূল্যবৃদ্ধি সমার্থক নয়।

অর্থের বাড়তি জোগান একদিকে যেমন চাহিদা বাড়িয়ে অর্থনৈতিক প্রগতিকে তরান্বিত করতে পারে, অন্যদিকে ব্যাপক পরিকাঠামো তৈরি এবং সামাজিক ক্ষেত্রের উন্নয়নে তার বিশেষ ভূমিকা থাকতে পারে। আর পরিকাঠামোর প্রসার কিংবা সামাজিক ক্ষেত্রের বিকাশ জোগানের অপ্রতুলতার সমস্যাও মেটায়। তাই ভোগ ব্যয়, বিনিয়োগ কিংবা রফতানি উদ্বৃত্ত বাড়ানোর ব্যাপারে সরকারি বেসরকারি মহলে আগ্রহ অথচ সরকারি ব্যয়ের বিরুদ্ধে প্রবল সমালোচনা—এই দ্বৈততা অন্তত চাহিদা বাড়ানোর পরিপ্রেক্ষিতে সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। চাহিদা বাড়াতে গেলে যে কোনও একটা পদ্ধতিই নেওয়া যেতে পার। আর এই চাহিদা-বৃদ্ধি মূল্যবৃদ্ধি করবে কি না তা নির্ভর করে জোগানের প্রকৃতি উপর।

এই জোগানের সমস্যা অন্য পথেও মূল্যবৃদ্ধি করতে পারে। হঠাৎ করে জোগান কমে যেতে পারে কিংবা উৎপাদনের উপকরণ ও কাঁচামালের দাম বেড়ে যেতে পারে। আর তেমন কিছু হলে জিনিসপত্রের দাম বাড়বেই। দাম বাড়ায় আবার চাহিদাও কমবে। ফলে জোগান-চাহিদা দুই-ই কমায় সামগ্রিক উৎপাদনই কমে যাবে। আর দেশে এখন সম্ভবত এটাই ঘটছে। কিছু কৃষিজাত পণ্যের অতিরিক্ত রফতানি কিংবা সাধারণভাবে কৃষিপণ্যের আড়তদারি হঠাৎ করে জোগানের অপ্রতুলতা তৈরি করেছে। তার সঙ্গে যোগ হয়েছে তেলের দাম বাড়া। এই দুইয়ে মিলেই তৈরি করছে ব্যাপক মূল্যবৃদ্ধি। আর এর মূল তো জোগানের সমস্যা, চাহিদা-বৃদ্ধি নয়! এই ব্যাপক দাম বাড়াই উল্টে চাহিদা কমিয়ে দিতে পারে। ফলে অর্থনৈতিক অবস্থার অবনতি হতে পারে।

এ-অবস্থায় তো নতুন জোগান তৈরি করা জরুরি। কৃষিপণ্যের জোগান বাড়ানোর জন্য সরকারের তরফে দৃঢ় পদক্ষেপ একান্ত প্রয়োজন। তা ছাড়া দেখা দরকার যাতে আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম বাড়লেও দেশে তার খুব একটা প্রভাব না পড়ে। অথচ, এ সব না করে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক চাহিদা কমাতে নেমে পড়েছে। এই পদক্ষেপের মূল কথাটা এটাই যে ব্যাঙ্ক এখন গৃহঋণ, ব্যক্তিগত ঋণ এমনকী বিনিয়োগের জন্য নেওয়া ঋণের উপর সুদের হার বাড়াবে। সুদের হার বাড়লে ঋণ নেওয়া কমবে। ফলে, অর্থনীতিতে অর্থের জোগান কমবে—পণ্যের চাহিদা কমবে। কিন্তু প্রশ্ন হল, মুদ্রাস্ফীতিই কি এখনকার মূল্যবৃদ্ধির কারণ! সমস্যা তো অন্যত্র, তা হলে মুদ্রাস্ফীতি থেকেই মূল্যবৃদ্ধি সেই সহজ সমীকরণ কেন? এই পদক্ষেপ তো কোনওভাবেই জোগান বাড়াবে না, উপরন্তু চাহিদা কমিয়ে অর্থনীতির সঙ্কোচন ঘটাবে।

আর অর্থমন্ত্রী পি চিদম্বরমের এখানেই আপত্তি। চিদম্বরমের অনুরোধেই তাই রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মতের পুনর্বিবেচনা। চিদম্বরম একদিকে যেমন জোগানের সমস্যার কথা স্বীকার করছেন, অন্যদিকে ভোগব্যয়, বিনিয়োগ ব্যয় না কমানোর কথাও বলছেন। অর্থনীতির যুক্তিতে এটাই সম্ভবত এ-মুহূর্তে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি।

কিন্তু সমস্যা অন্যত্র। যোজনা কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান মন্টেক সিং আহলুয়ালিয়া আর চিদম্বরমের বিতর্ক, অর্থমন্ত্রীর অবস্থানের স্ববিরোধিতার পরিচয়ই দিচ্ছে। যখন মন্টেক চাইছেন একাদশ যোজনার জন্য আর-ও বেশি বরাদ্দ— পরিকল্পনা খাতে আর-ও বেশি সরকারি ব্যয়, তখন চিদম্বরম তার বিরুদ্ধে জোরালো সওয়াল করছেন আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের বাতলানো সমাধানমতো রাজকোষ ও রাজস্ব ঘাটতি কমানোর দোহাই দিয়ে। সরকারি আয় ব্যয়ের ঘাটতি কমাতে হবে, কারণ তা না হলে মুদ্রাস্ফীতি হবে, যার অবধারিত ফসল না কি মূল্যবৃদ্ধি! প্রথমত : এখানেও সেই পুরনো মুদ্রাস্ফীতি-মূল্যবৃদ্ধির সমীকরণ, যা তর্কাতীত নয়। দ্বিতীয়ত, অর্থমন্ত্রীর অবস্থানে ভারসাম্যের অভাব। একদিকে যখন তিনি সুদ বাড়িয়ে চাহিদা কমানোর বিরোধিতা, অন্যদিকে আবার যোজনা বরাদ্দ বাড়িয়ে চাহিদা বাড়ানো-ও তিনি চান না। যোজনা কমিশনের বিরোধিতা করেও তিনি এমনকী ভোগব্যয়, বিনিয়োগ-ব্যয় বাড়ানোরও পক্ষে, যাতে অর্থনৈতিক প্রগতি অবরুদ্ধ না হয়।

আসলে বিরোধটা অন্য জায়গায়। বেসরকারি ব্যয় বাড়াতে তাঁর আপত্তি নেই। কিন্তু সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি নৈব নৈব চ! তাই এটা আসলে স্ববিরোধ নয়। বাজার ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও সরকারের সঙ্কোচন এই রাজনৈতিক আদর্শেরই এটা একটা প্রতিফলন। অর্থনীতির বিশুদ্ধ যুক্তি নয়, এর পিছনে আছে বিশেষ রাজনৈতিক অবস্থান।

(লেখক বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতনের অর্থনীতি ও রাষ্ট্রনীতি বিভাগের অধ্যাপক)

কারিগরি শিক্ষা : চাকরির সন্ধান না গোলকধাঁধা

সৌম্য চক্রবর্তী

খুব সম্প্রতি সংবাদপত্রের দৌলতে একেবারে পরস্পরবিরোধী দুটো খবর পাওয়া গেল।

খবর (১) : শোনা যাচ্ছে, জয়েন্ট এন্ট্রান্স বোর্ড ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ভর্তির মেধা-তালিকাটাকে এতটাই বাড়িয়েছে যে, ঊনসত্তর হাজারের কাছাকাছি ছাত্রদেরও ডাকা হয়েছে কাউনসেলিং-এর জন্য, যদিও মোট আসন মাত্র পনেরো হাজারের মতো। এর ফলে জয়েন্টে এমনকী, দশ-বারো শতাংশ নম্বর পাওয়া ছেলেমেয়েরাও ডাক পেয়েছে। এটা ঘটেছে বেসরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজগুলোর চাপে। এরা বাধ্য করছে মেধা-তালিকাটাকে ক্রমাগত বাড়াতে যাতে এঁদের আসনও খালি না থাকে।

এক্ষেত্রে অনেক প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে, অনেকে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার সুযোগ পাচ্ছে, এটা তো ভালই। কিন্তু সত্যিই তাই? দ্বিতীয়ত, বেসরকারি কলেজের মুনাফার অঙ্ক মেলাতে সরকার কেন মাঠে নামবে? এটা কি সরকারের কর্তব্য? আর একটা অস্বস্তিকর প্রশ্নও হঠাৎ করে সামনে চলে এসেছে : মাত্র পনেরো হাজার আসন, অথচ ঊনসত্তর হাজার ছাত্রছাত্রীকে ডাকা হচ্ছে কেন? তা হলে কি ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার আগ্রহ কমছে? এ-প্রশ্নের উত্তর অবশ্য পাওয়া যেতে পারে অন্য একটা খবরে।

বেসরকারি কলেজগুলো চাপ দিয়ে ছাত্রভর্তি করাচ্ছে মুনাফার লোভে। দিশাহীন অভিভাবকরা সেই ফাঁদে পা দিচ্ছেন।

খবর (২) : রাজ্যের ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজগুলো থেকে পাস করে বেরনো ছাত্রছাত্রীর একটা বড় অংশই উপযুক্ত কাজ পায় না। অন্যদিকে, কলকাতা শহরের বিভিন্ন কোম্পানিতে কর্মরত ইঞ্জিনিয়ারদের পঞ্চাশ শতাংশই রাজ্যের বাইরে থেকে আসা। আমাদের রাজ্যের সদ্য পাস করা ইঞ্জিনিয়ারদের একটা বড় অংশই না কি চাকরি পাওয়ার যোগ্য নন। তাই, রাজ্য সরকার এই সদ্য পাস করাদের জন্য 'ফিনিশিং স্কুল' করতে চলেছেন যেখানে শিল্পের চাহিদামতো ট্রেনিং দেওয়া হবে।

প্রশ্ন হল, তা হলে ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্সটা কী শেখাল? বিপুল অর্থের বিনিময়ে বেসরকারি কলেজ কী শিক্ষা দিল?

একদিকে হঠাৎ গজিয়ে ওঠা অসংখ্য বেসরকারি কলেজ থেকে পাস করা ছাত্রছাত্রীর চাকরি নেই, অথচ অন্যদিকে, সরকার সচেষ্ট যাতে এইসব কলেজের মুনাফায় টান না পড়ে। হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়ানো ছেলেমেয়েদের ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার স্বপ্ন দেখিয়ে মোটা টাকার বিনিময়ে ভর্তি করা হচ্ছে ওইসব প্রতিষ্ঠানেই। এখানে যেন মুনাফার যুক্তিটাই বড়, শিক্ষার মান, উদ্দেশ্য এসব তত গুরুত্বপূর্ণ নয়। আর সবচেয়ে বড় কথা ওইসব 'ইনস্টিটিউট'-এ ভর্তি হওয়া ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যৎ কতটা উজ্জ্বল? এটা কি সার্বিক অনিশ্চয়তা-অস্থিরতা ও অসহায়তার সুযোগ নেওয়া নয়?

অথচ, কে বলতে পারে, ওইসব ছেলেমেয়ে অন্য কোনও ক্ষেত্রে সঠিক শিক্ষা/দিশা পেলে তাদের এবং বৃহত্তর সমাজের পক্ষে সেটা অনেক বেশি কল্যাণকর হত কি না। সেটা খুঁজে দেখাই তো একটা সমাজের আর তার তথাকথিত অভিভাবক-সরকারের কর্তব্য হওয়া উচিত। মুল্যবান মানব-সম্পদের অপচয় না করে তার সঠিক ব্যবহার হওয়া দরকার। তা যেমন ব্যক্তির পক্ষে লাভজনক, তেমনই সমাজের পক্ষেও সবচেয়ে বেশি স্বাস্থ্যকর। মানব-সম্পদের পরিকল্পনা দরকার যাতে ভবিষ্যতে অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে চাহিদা ও জোগানের ভারসাম্য বজায় থাকে। অর্থাৎ, অর্থনীতির নির্দিষ্ট গতি-প্রকৃতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই মানব সম্পদের সার্বিক বিকাশ ও ব্যবহার প্রয়োজন। আর সেই প্রক্রিয়া আবার অন্যদিক থেকে আর্থিক প্রগতিকেই ত্বরান্বিত করে। প্রত্যেকেই সমাজের কাছ থেকে সঠিক গুরুত্ব ও মূল্য পায়, যা একটা সার্বিক উৎসাহ-উদ্দীপনা তৈরি করে। অথচ, সে সব কিছু না করে সবটাই ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে খোলা বাজারের মর্জির উপর।

বেসরকারি কলেজগুলো চাপ দিয়ে ছাত্রভর্তি করাচ্ছে মুনাফার লোভে। দিশাহীন অভিভাবকরা সেই ফাঁদে পা দিচ্ছেন। কিন্তু, ওইসব কলেজ থেকে পাস করা ইঞ্জিনিয়াররা চাকরি পাবেন তো! যদি ধরে নিই, জয়েন্টের মেধা তালিকা ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার সত্যিকারের মাপকাঠি নয়, জয়েন্ট এন্ট্রান্সে যে কোনও নম্বর পাওয়া ছাত্রকেই শিখিয়ে পড়িয়ে ইঞ্জিনিয়ার করে তোলা যায় তবে ওই পরীক্ষার যৌক্তিকতা বা প্রয়োজন কী? সবটা বাজারের হাতে ছেড়ে দিলেই হয়।

মুনাফা বজায় রাখতে ওইসব কলেজ হয়তো মেধা তালিকার তলার দিক থেকে ভর্তি হওয়া ছাত্রছাত্রীদের পাস করিয়ে দেবে, যাতে বছর বছর ছাত্রভর্তিতে টান না পড়ে। কিন্তু এই পাস করাদের বাজার দর থাকবে তো। না কি এইসব ইঞ্জিনিয়ার শেষ পর্যন্ত অন্য কোনও 'সাধারণ' চাকরিতেই ঢুকতে বাধ্য হবেন? তা হলে এত অপচয়ের প্রয়োজন কী?

প্রশ্ন উঠবে, এভাবে কতদিন চলবে? আসলে, এই প্রক্রিয়ার দুটো সম্ভাব্য পরিণতি হতে পারে। এভাবেই কিছুদিন টিকে যেতে পারে একটা নিম্নমানের অর্থনৈতিক চক্র : নিচুমানের কলেজ, নিচুমানের শিক্ষা, নিচুমানের শিল্পে তার প্রয়োগ। কিন্তু, একদিন না একদিন তো এই নিম্নমানের কলেজগুলো বাজারে প্রতিযোগিতার চাপেই হারিয়ে যাবে। তখন মুনাফার খোঁজে পুঁজি দৌড়বে অন্য কোথাও। সমস্যাটা তো সেখানেই। তখন ওইসব কলেজ থেকে পাস করা-রা যাবেন কোথায়। সেই বিপুল মানবিক ক্ষতির দায় কে নেবে। এভাবেই হয়তো বাজার তথাকথিত সর্বব্যাপী 'ভারসাম্য' ও 'দক্ষতা'র জন্ম দেয়, কিন্তু তার সামাজিক ব্যয় যে বড্ড বেশি। আর, এ-অবস্থায় শিক্ষার সঙ্গে সমাজ গঠনের সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা যেন নিতান্তই অবান্তর হয়ে পড়ে।

(লেখক বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতনে অর্থনীতি ও রাষ্ট্রনীতির অধ্যাপক)

পুঁজির ভাষায় কথা না বললে বাজার মেনে নেবে কেন

সৌম্য চক্রবর্তী

“আমাদের দেশে এখানে সেখানে দুরে দুরে গুটিকয়েক বিশ্ববিদ্যালয় আছে, সেখানে বাঁধাধরা নিয়মে যান্ত্রিক প্রণালীতে ডিগ্রি বানাবার কারখানাঘর বসেছে। এই শিক্ষার সুযোগ নিয়ে ডাক্তার এঞ্জিনিয়র উকিল প্রভৃতি ব্যবসায়ীদের সংখ্যাও বেড়ে চলেছে। কিন্তু সমাজে সত্যের জন্য কর্মের জন্য নিষ্কাম আত্মনিয়োগের ক্ষেত্র প্রতিষ্ঠা হয়নি।” আমরা ভুলে গেছি “বিদ্যা শিক্ষার নিম্নতর লক্ষ্য ব্যবহারিক সুযোগ লাভ, উচ্চতর লক্ষ্য মানবজীবনে পূর্ণতা-সাধন”। (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী প্রবন্ধ)।

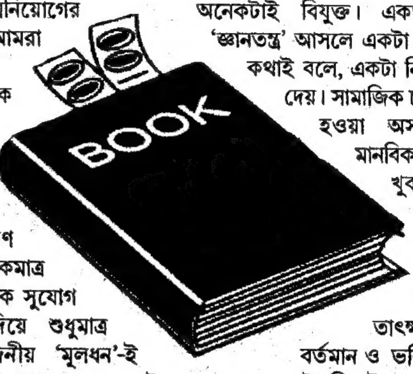

ভুলে গিয়েছি কারণ আমাদের কাছে শিক্ষার একমাত্র উদ্দেশ্য তো ওই ‘ব্যবহারিক সুযোগ লাভ’। শিক্ষার মধ্যে দিয়ে শুধুমাত্র উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় ‘মূলধন’-ই জোগাড় করা, যাতে পড়াশোনার শেষে মোটা মাইনের চাকরিটা মেলে। তা হলেই কেল্লা ফতে!

আর তা হবে না-ই বা কেন। যেখানে ‘জ্ঞান-প্রজ্ঞা’ এসবের একমাত্র পরিণতিই না কি ব্যক্তিগত দক্ষতা অর্জন, সেখানে আমাদের মতো অতিসাধারণ মানুষের পালানোর পথ কোথায়? আমাদেরও সেই নিয়ম মানতেই হবে। ‘জ্ঞানতন্ত্রে’ ভাসতে ভাসতে আমাদের দক্ষ শ্রমিক হয়ে উঠতে হবে। অবশ্য ‘কর্মদক্ষতা’ পছন্দ হলে বাজার আমাদের লুফে নেবে। সেক্ষেত্রে শুধু পুঁজিই (Capital) নয়, আমরাও না কি ‘মুনাফা’ অর্জন করতে পারব। পুঁজির আয়-ব্যয়ের হিসেব আর শ্রমিকের লাভ-ক্ষতির নিয়মটা না কি একই রকম হবে। বিশেষ কর্মদক্ষতার ‘পুঁজি’ খাটিয়ে জ্ঞানতন্ত্রের শ্রমিক (knowledge worker) না কি বাড়তি আয় পেতেই পারে।

কিন্তু সত্যিই কি পুঁজি- শ্রমের অসাম্য/বিরোধ মিটে যাবে? সমস্যা হল, কে ‘প্রাজ্ঞ’ আর কে নয় তা ঠিক হবে শুধুমাত্র পুঁজির নিয়মেই। অর্থাৎ, পুঁজির বিচারে যে দক্ষ সেই ‘উপযুক্ত’ মূল্য পাবে। যে তা নয়, তার যত গুণ-ই থাক সে গুণ মূল্যহীন। তাই বেশিরভাগ সময়ে সেই মানুষটাই কেমন যেন মূল্যহীন হয়ে পড়ে।

আসলে, সমাজের একটা বড় অংশকেই তো শেখানো হয় যে সব সময় কর্মদক্ষতা প্রমাণ করতে হবে, তবেই সমাজের কাছ থেকে সবচেয়ে বেশি দাম পাওয়া যাবে। সব ব্যাপারেই প্রথম হতে হবে, অন্যেকে ছাপিয়ে যেতে হবে। বৃহত্তর সমাজ নিয়ে ভাবার দরকার নেই— সময়ও নেই। ব্যক্তিগত উৎকর্ষই সমাজের সার্বিক উন্নতির চাবি-কাঠি। তাই ওই মানুষ শুধু প্রতিযোগিতার ভাষাই বোঝে। সেটা পুঁজির-ই ভাষা। তাই অন্য ভাষায় কথা বললে চলবে কেমন করে?

জ্ঞান এখন শুধুমাত্র ব্যক্তিগত উৎপাদনদক্ষতা অর্জনের চাবিকাঠি। বৃহত্তর সমাজের গতি-প্রতিকৃতি, সামাজিক প্রয়োজন এসবের থেকে তা অনেকটাই বিযুক্ত। একভাবে দেখলে এই ‘জ্ঞানতন্ত্র’ আসলে একটা নির্দিষ্ট ধরনের চর্চার কথাই বলে, একটা নির্দিষ্ট জ্ঞানের ধারণাই দেয়। সামাজিক চর্চার মধ্যে দিয়ে তৈরি হওয়া অসংখ্য সামাজিক ও মানবিক বোধের স্থান সেখানে খুবই কম। আর মাঝে-মাঝেই এই দুই বোধের বিরোধ বাধে। ব্যক্তি ও সমষ্টির বিরোধ, তাৎক্ষণিকতা ও স্থায়িত্বের, বর্তমান ও ভবিষ্যতের বিরোধ, শুধু আজকেরটা নিয়েই যেন যত ব্যস্ততা, কাল এর ফল কী হবে তা ভাবার সময় নেই।

আর পাঁচটা পণ্যের বাজারের মতোই চলে আজকের শিক্ষার/জ্ঞানের বেচা কেনা। বলা হচ্ছে, এভাবেই না কি জ্ঞানতন্ত্র বিকাশ হয়। অর্থনীতির অন্যান্য ক্ষেত্রের সঙ্গে শিক্ষাক্ষেত্রের আদান-প্রদানের মাধ্যমেই সেই জ্ঞানের বিকাশ ও তার প্রয়োগ হচ্ছে। অর্থাৎ, শিল্প কিংবা পরিষেবার উৎপাদনের সঙ্গে শিক্ষা-কে জুড়ে দিলেই সব সমস্যার সমাধান। সমাজও তর-তর করে এগিয়ে যাবে।

এই যুক্তিটার মূল ভিত্তি এটাই যে, শিক্ষা শুধুমাত্র নিয়োগযোগ্য পণ্যই তৈরি করে যা অর্থনীতির নানা উৎপাদন ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। আর তাই অন্যান্য পণ্যের মতোই শিক্ষার বাজারও ভারসাম্য ও দক্ষতা তৈরি করে। বাজার-ই বলে দেয় কোন পণ্য কতটা তৈরি করতে হবে এবং তার দাম কত হবে। আবার বাজারই বলে দেয় পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে কোন পণ্য উৎপাদন বন্ধ করে কোনটা করা দরকার। সমস্যা হল, মানুষের জ্ঞান যেখানে পণ্য সেখানে, পণ্য নিয়ে বাজারের ওই খেলা মানে এক অর্থে মানুষ নিয়েই খেলা। সে খেলা মুনাফার যুক্তিতে হয়তো, যৌক্তিক, কিন্তু বৃহত্তর সমাজ তো তার বাইরেও অনেক বেশি কিছু। মুনাফার যুক্তিতে যা অপ্রয়োজনীয়, সমাজে তো তার প্রয়োজন থাকতেই পারে!

(লেখক অর্থনীতির অধ্যাপক, বিশ্বভারতী)।

পুজোয় কেনাকাটার ভিতরে আছে সামাজিক প্রভাব

সৌম্য চক্রবর্তী

এখন উৎসবের সময়। উৎসব মানেই তো সবার তাতে যোগ দেওয়া। যত বেশি মানুষ উৎসবে মাতবেন ততই তা রঙিন হয়ে উঠবে। এ সময় একলা চলার সময় নয়, সবাই মিলে উৎসাহ-উদ্দীপনা-আনন্দ ভাগ করে নেওয়ার সময়।

উৎসবে শুধু বহু মানুষের মানসিক যোগাযোগই তৈরি হয় না, অর্থনৈতিকভাবেও তাঁরা যুক্ত হয়ে পড়েন। আর, যখন উৎসবের একটা বড় অংশ জুড়ে থাকে নানারকম জিনিসপত্রের কেনা-বেচা, তখন ওই অর্থনৈতিক যোগাযোগটা আরও দৃঢ় হয়। হঠাৎ করে বছরের এই সময়টায় অর্থনীতিতে খানিকটা জোয়ার আসাই স্বাভাবিক। যেহেতু সার্বিক ভাবেই কেনা-বেচাটা বেড়ে যায়, মানুষ হাত খুলে খরচ করে, এই সময়টার জন্য প্রায় সারা বছর অপেক্ষা করে থাকেন ছোট-বড় অসংখ্য উৎপাদক ও ব্যবসায়ী।

বছরের অন্যান্য সময়ের তুলনায় এক সঙ্গে অনেক মানুষের অনেক বেশি ব্যয় হঠাৎ করেই জিনিসপত্রের চাহিদা বাড়িয়ে অর্থনীতিকে খানিকটা চাঙ্গা করে তোলে। এক-জনের ব্যয় মানেই যেহেতু আর একজনের আয়, তাই উৎসবের সময় বহু-মানুষের সাময়িক হলেও একটা আয় বৃদ্ধি হয়ই। এভাবে উৎসবের একটা অর্থনৈতিক যৌক্তিকতাও খুঁজে পাওয়া যেতেই পারে।

এক্ষেত্রে অর্থনীতির তত্ত্ব খুবই প্রাসঙ্গিক। তত্ত্ব অনুসারে, যদি ১০০ টাকা ব্যয় করা হয় জিনিসপত্রের কেনা-বেচায় তবে অর্থনীতিতে সার্বিকভাবে ১০০ টাকার থেকে বেশি মূল্য তৈরি হয়। ধরা যাক, আপনি পুজোর কেনাকাটায় আপনার মাস-খরচের তুলনায় অতিরিক্ত ১০০ টাকা খরচ করলেন। তাই, বিক্রেতা পেলেন ওই ১০০ টাকাই। কিন্তু তিনি আবার ওই টাকার পুরোটাই কিংবা নিদেনপক্ষে তার একটা অংশ তাঁর নিজের দৈনন্দিন নানারকম খরচে লাগালেন। ধরা যাক সেটা অন্তত্পক্ষে ৬০ টাকা। অর্থাৎ, অর্থনীতির পরিভাষায় বললে, "ব্যয়-প্রবণতা" ৬০ শতাংশ (ভারতবর্ষের গড় ব্যয়-প্রবণতা মোটামুটি ৬৫ শতাংশ)। বাকিটা ওই বিক্রেতা আপাতত জমিয়ে রাখলেন। কিন্তু এই ৫০ টাকা খরচই আবার অন্য একজন বা অনেকের আয়-বৃদ্ধি করল। তারপর তাঁরা আবার এই ৬০ টাকার একটা অংশ খরচ করলেন। এভাবেই চলতেই থাকল হিসেবটা।

তাই, আপাতভাবে অদ্ভুত লাগলেও এটাই সত্যি যে আপনার ১০০ টাকা 'পুজোর খরচ' ১০০ টাকার থেকে অনেকটাই বেশি চাহিদা তৈরি করল। আর জোগান বাড়ানোর সমস্যা না থাকলে, এর ফলে, সার্বিকভাবেই উৎপাদন, আয়, কর্মসংস্থান এসব বাড়বে। হিসেব করে দেখানো যায় সেই উৎপাদন বা আয় বৃদ্ধি ১০০ টাকার থেকে অনেক বেশি।

কিন্তু সমস্যা হল, ওই বিক্রেতা যদি তাঁর ১০০ টাকা আয়ের থেকে এখনই ৬০ টাকা খরচ না করে তার কম করেন, তবে মোট উৎপাদন/আয় বৃদ্ধিও অনেকটাই কম হবে। অর্থাৎ, ব্যয় প্রবণতা কম হলে অর্থনীতির লাভ তেমনভাবে হবে না। দেখা গিয়েছে, যাদের আয় বেশি তাদের এই ব্যয়-প্রবণতা কম। তাই আপনি কার থেকে জিনিস কিনছেন সেটা আপনার কাছে প্রায় গুরুত্বহীন হলেও বৃহত্তর অর্থনীতির প্রাথমিক ওঠা-পড়ায় তার যথেষ্ট প্রভাব আছে। যদি আপনি এমন কোন বিক্রেতার থেকে পুজোর জামাকাপড় কেনেন যিনি আপনার দেয় টাকাটা তখনই খরচ করলেন না, তা হলে সার্বিক অর্থনীতির উপর আপনার খরচের প্রভাব আপাতত ওখানেই সীমাবদ্ধ রইল। আর উল্টোদিকে ওই টাকা যদি খরচ হয়ে যায় তবে তখন তখনই অর্থনীতিতে তার প্রভাব পড়ে। সমস্যাটা বোঝা যায় আর একটু এগোলে। এবার পুজোর সবাই মিলে বেরিয়ে, ধরা যাক, আপনি বেশ কয়েক প্যাকেট 'চিপস' (বা কয়েকটা আইসক্রিম) কিনলেন। তাতে আপনার খরচ হল ৩০ টাকা। এখন, আপনি যদি কোনও বড় বহুজাতিক কোম্পানির 'ব্রান্ডেড' 'পট্যাটো চিপস' কেনেন, তবে আপনার টাকা ওই কোম্পানির ঘরে গেল। তার থেকে প্রাথমিকভাবে ট্যাক্স, নানা ধরনের মজুরি-মাইনে, উপকরণের খরচ এসব বাদ দিয়ে বাকিটা গেল 'মালিকদের' কাছে। আর এই অংশটা যে বিরাট তা নিয়ে সন্দেহ নেই। খুব অল্প অংশই এল এমন লোকেদের হাতে যাদের আয় কম আর ব্যয়-প্রবণতা বেশি। উল্টোদিকে, ওই ৩০ টাকার বিপুল অংশ গেল মুনাফা বাড়াতে যার খুব অল্পই আবার তাৎক্ষণিকভাবে আঞ্চলিক অর্থনীতিতে ব্যয় হল।

অবশ্য, এই মুনাফার থেকে বিনিয়োগ হতে পারে, যদিও তা একটা দীর্ঘমেয়াদী ব্যাপার। আর এই বিনিয়োগ যে আঞ্চলিক অর্থনীতিকেই চাঙ্গা করবে এমন কোনও নিশ্চয়তাও নেই। সবচেয়ে বড় কথা, ওই বিনিয়োগ আরও বেশি মুনাফা তৈরি করবে সন্দেহ নেই, কিন্তু তা কতটা কর্মসংস্থান সৃষ্টি করবে সেটা তর্কাতীত নয়। সচরাচর বড় বেশি-বিদেশি কোম্পানি চিপস কিংবা আইসক্রিম তৈরি করতে 'পুঁজি নিবিড়' প্রযুক্তিই ব্যবহার করে। এতে কর্মসংস্থানের সুযোগ তাই খুব কম।

ওদের পুজো আমাদের পুজো

অঙ্কন : শান্তনু দে

অর্থাৎ, আপনার পট্যাটো চিপস/আইসক্রিম কিংবা বড়/দামি ব্র্যান্ডের জামাকাপড় কেনা প্রাথমিকভাবে সমষ্টিগত আয়বৃদ্ধিকে খুব কমই প্রভাবিত করতে পারল। আর কর্মসংস্থানের উপর তার প্রভাব একেবারেই নগণ্য।

অন্য দিকে, আপনি যদি কোনও ছোট কোম্পানির 'আলু চিপস' কেনেন কিংবা কাপড় কিনে পাড়ার দর্জিকে দিয়ে জামা-প্যান্ট, সালোয়ার-কামিজ বানান, তবে আপনার টাকা যাবে মালিক-শ্রমিক নির্বিশেষে এমন অনেক মানুষের হাতে যাদের সবার আয়ই কম আর তাই ব্যয়-প্রবণতা খুবই বেশি। এর কারণ ওই 'আলু চিপস' তৈরি হয়েছে এমন কারখানায় যেখানে 'পুঁজির' পরিমাণ নগণ্য। বরং সেই উৎপাদন একেবারেই শ্রম-নির্ভর। তাই তার কর্মসংস্থান তৈরির ক্ষমতাও বড় কোম্পানির তুলনায় অনেক বেশি। অন্য দিকে, এইসব ছোট কারখানার প্রযুক্তি 'শ্রম-নিবিড়', তাই মালিক-শ্রমিক দুয়ের আয়ই কম। ফলত ব্যয়-প্রবণতা অনেক বেশি। এক দিকে বেশি কর্মসংস্থান, অন্যদিকে তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি ব্যয়-প্রবণতা। তাই, আপনার চিপস কেনার ফল হতে পারে সুদূরপ্রসারী। অনেক মানুষ তাতে উপকৃত হতে পারেন। এখন প্রশ্ন উঠতে পারে বড় কোম্পানির 'উন্নত' পণ্যের সঙ্গে কি 'সস্তা' চিপসের তুলনা চলে! কিন্তু মিডিয়ার কল্যাণে আর আমাদের অভিজ্ঞতায় এখন বোধহয় আমরা এটা বুঝে গিয়েছি যে, অনেক ক্ষেত্রেই দামই পণ্যের মানের সঠিক মাপকাঠি নয়। আসলে, বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে 'ব্র্যান্ড-ভ্যালু' তৈরির একটা প্রক্রিয়া কাজ করে চলেছে। শেখানোর চেষ্টা হচ্ছে 'ফ্যাশন' টাই বড় কথা। তাই জামাকাপড় থেকে শুরু করে, পুজোয় নতুন সাজে সেজে ওঠার সব টুকিটাকি জিনিস কেনার সময় মনে রাখবেন আপনার ওই ছোট্ট কাজেরও একটা সামাজিক প্রভাব আছে। অসংখ্য ক্ষুদ্র শিল্পে শ্রম নিবিড় পদ্ধতিতে তৈরি হওয়া জিনিসপত্র কিনলে আপনি হয়তো ঠকবেন না। আর তার সঙ্গে উপরি পাওনা তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ; পুজোকে আরও একটু সর্বজনীন করে তোলার সুযোগ।

● লেখক বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক

নতুন উন্নয়ন-মডেলের অভিজ্ঞতা সেই আগের মতোই হবে না তো

সৌম্য চক্রবর্তী

আমাদের দেশে, বিশেষত রাজ্যে 'উন্নয়ন' শব্দটা একটা চর্চার বিষয় হয়ে উঠেছে। রাজনৈতিক কিংবা তাত্ত্বিক মহল ছাড়িয়ে সেই আলোচনা আরও অনেকটা দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে গিয়েছে। এটা দেখলে মনে হতে পারে উন্নয়ন নিয়ে এমন ভাবনা বোধ হয় আগে আমাদের রাজ্যে তেমনভাবে ছিল না। সেটা কিন্তু একেবারেই ঠিক নয়। রাজ্যে যা হচ্ছে তা এক বিশেষ ধরনের উন্নয়ন। আর তার সপক্ষে জনমত তৈরির একটা জোরদার চেষ্টা চলছে। তাই ঢাক-ঢোল পিটিয়ে একেবারে বিজ্ঞাপন দিয়ে উন্নয়নের প্রচার হচ্ছে। এই উন্নয়নের বিজ্ঞাপন সত্যিই নতুন ব্যাপার। অনেক সময়েই বিজ্ঞাপনের ঠেলায় উন্নয়নের আসল মুখটা যেন ঢাকা পড়ে যাচ্ছে। হাইওয়ে, হাইরাইজ, ফ্লাই-ওভার, শপিং মল এ সবের ঔজ্জ্বল্যে লক-আউট, উচ্ছেদ, শ্রম ও শ্রমিকের অবমূল্যায়ন—অবমাননা, বেড়ে চলা অস্থিরতা—টেনশন ভুলিয়ে দেওয়ার ও ভুলে যাওয়ার চেষ্টা চলছে। আর সেটাই সবচেয়ে ক্ষতিকর। তাড়াহুড়ো করে একটা উন্নয়নের তথাকথিত নতুন মডেলকে লাগু করা চেষ্টা হচ্ছে। অথচ পুরো ছবিটা সামনে আনা হচ্ছে না। আমরা কি সত্যিই সার্বিক উন্নয়ন নিয়ে ভাবিত? না কি জোড়াতালি দিয়ে কিছু একটা করে ফেলাই উদ্দেশ্য? আসলে আগেও আমরা অনেক ক্ষেত্রেই এ রকম দেখেছি। তাই ভয় হয়, ভুল হলে যে বিপুল সামাজিক ক্ষতি তার ভার বহন করবে কে!

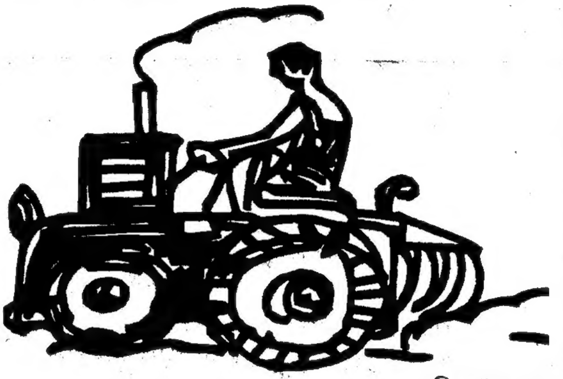

ছবি : শান্তনু দে

কেন এমন হঠাৎ করে নতুন উন্নয়ন- মডেলের দরকার পড়ল। পুরনো মডেলের সমস্যাগুলি নিয়ে কি আমরা যথেষ্ট ভেবেছিলাম? না কি ভোটের রাজনীতির চাপে হঠাৎ করে তথাকথিত নতুন মডেল আমদানি করতে হল? এ ক্ষেত্রে তথাকথিত পুরনো উন্নয়ন মডেলের পর্যালোচনা প্রাসঙ্গিক। আর আমাদের অর্থনীতির পক্ষে, বিশেষত কর্মসংস্থানের নিরিখে কৃষিক্ষেত্র যেহেতু এখনও খুবই গুরুত্বপূর্ণ তাই সরকারের পুরনো কৃষিনীতি ও তার পরিবর্তন উন্নয়ন সম্পর্কে সরকারের মতামত কী তার একটা আভাস দেয়। ভূমিসংস্কার সেই কৃষিনীতির ভিত্তি।

ভূমিসংস্কার নিয়ে সরকারের উদ্যোগ প্রাথমিকভাবে একটা বিশেষ অর্থনৈতিক মডেল—একটা বিশেষ উন্নয়ন ভাবনারই পরিচয় দেয়। সেই ভাবনার মূল কেন্দ্রে থাকার কথা কৃষি অর্থনীতির ও গ্রামীণ খেটে খাওয়া মানুষের। তার সঙ্গে এটাও বলা হয় যে, ভূমি সংস্কারের মধ্যে দিয়ে গ্রামীণ সমাজের উন্নয়ন হলে তার ধাক্কায় বা সাহায্যে শিল্প সমেত অন্যান্য ক্ষেত্রেরও উন্নতি হবে। ফলে, একটা সার্বিক উন্নতির পরিবেশ তৈরি হবে। এভাবে ভূমিসংস্কারকে উন্নয়নের একটা মোক্ষম হাতিয়ার হিসেবে হাজির করা হয়েছিল। ভূমিসংস্কার মানে শুধু গ্রামের গরিবের উন্নতিই নয়, অকৃষি ক্ষেত্রের উন্নয়নেও তার যথেষ্ট ভূমিকা আছে। এভাবেই হাজির করা হয়েছিল পুরনো উন্নয়ন-মডেলটা।

কিন্তু আবার সেই একই সমস্যা। এ ক্ষেত্রেও সবদিক ঠিক মতো দেখা হল না। হইহই করে নেমে পড়ল সেই মডেল। গরিব মানুষের হাতে ক্ষমতা দেওয়ার কথা শুধু গ্রামের অসংখ্য সাধারণ মানুষকেই টেনে আনল না, বুদ্ধিজীবী মহলও এতে আকৃষ্ট হল। সবটাই এল 'দিন-বদলের' আহ্বান হিসেবে। এখন ভাবলে অবাক লাগে, কিন্তু উন্নয়নের সেই মডেলকে হাজির করা হয়েছিল 'মুক্তির সোপান' হিসেবেই। আর সেই মুক্তি মানে তো শুধু জনগণের আর্থিক উন্নতি নয়, বরং একটা সার্বিক উন্নয়নের পরিবেশ—স্বাধীনতার আস্বাদ—আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার। আর আজ দেখছি সেই মডেলকেই ঝেড়ে ফেলার প্রবল চেষ্টা। গলদটা কি গোড়ায়?

ভূমিসংস্কার মানে যেন শুধুই জমির পুনর্বণ্টন কিংবা ভাগচাষির অধিকারকে সুনিশ্চিত করা। কিন্তু চাষ তো শুধু জমি দিয়েই হয় না! একজন অতিক্ষুদ্র প্রান্তিক চাষিকে অথবা ভূমিহীন কৃষক, কৃষিশ্রমিককে শুধু একখণ্ড জমি দিলেই হবে না। তার সঙ্গে সস্তায় যথেষ্ট পরিমাণে বীজ, সার, কীটনাশক, সেচের জল এ-সবের ব্যবস্থাও থাকতে হবে। আর সবশেষে লাগবে ফসলের বাজারের ব্যবস্থা। অর্থাৎ, সমস্ত উপকরণ মিলিয়ে চাষ করে ফসল লাভজনক দামে বেচতে পারলে তবেই ভূমিসংস্কারের সুফল মিলবে। কৃষিক্ষেত্রে যুক্ত অসংখ্য মানুষের শ্রীবৃদ্ধি হবে। তাতে শুধু গ্রামীণ অর্থনীতিই চাঙ্গা হবে না, কৃষি-উৎপাদন বাড়লে উদ্বৃত্ত ফসল অকৃষি ক্ষেত্রের প্রসারেও কাজে লাগবে।

কিন্তু এ-সব সম্ভব যদি উপকরণের জোগান আর ফসলের চাহিদা ঠিকঠাক থাকে। তা না হয়ে মহাজন, বড় ব্যবসায়ী, বড় চাষি কিংবা আড়তদারের আধিপত্য থাকলে শুধু জমির পুনর্বণ্টনের মাধ্যমে উন্নয়নের মডেল বেশিদিন টেঁকে না। তাই বিচ্ছিন্নভাবে জমির পুনর্বণ্টন তাৎক্ষণিক উদ্যম-উদ্দীপনা তৈরি করলেও তা তেমন ভাবে দীর্ঘমেয়াদী হয় না। ক্ষুদ্র/ প্রান্তিক চাষিকে টিকতে গেলে সহজ শর্তে ঋণ, সুলভে বীজ-সার-কীটনাশক আর সবশেষে ফসল সরাসরি বাজারে বিক্রি করার সুযোগ পেতে হবে।

আর সবচেয়ে বড় হল, কৃষিতে প্রযুক্তির উন্নতির প্রশ্নটা। অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃষকভিত্তিক কৃষির সৃষ্টি হয় ভূমিসংস্কারের মধ্যে দিয়ে। এর সঙ্গে যুক্ত হয় পরিবার ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে জোত ভেঙে যাওয়া। ফলে বহু ছোট জোত তৈরি হয়। এইসব প্রান্তিক চাষির এমন উদ্বৃত্ত থাকে না যা দিয়ে তারা উন্নত বীজ, উন্নত সার, কীটনাশক এসব খোলা বাজার থেকে কিনতে পারে, যথেষ্ট সেচের ব্যবস্থা করতে পারে, কিংবা যন্ত্রের প্রয়োজনীয় ব্যবহার করতে পারে। এইসব উন্নত উপকরণের অভাবে উৎপাদনশীলতা বাড়ানো খুবই কঠিন।

আর ঠিক এমনটাই ঘটেছে আমাদের রাজ্যেও। প্রাথমিকভাবে কৃষির উৎপাদনশীলতা, আয় বেড়েছে ঠিকই, কিন্তু তা আর ধরে রাখা যাচ্ছে না। তাই ভূমিসংস্কারের প্রাথমিক সাফল্য সরকারের স্থায়িত্ব বাড়ালেও, সরকার এখন অন্যদিকে মন দিতে চাইছে। অথচ ভূমিসংস্কারকে কেন্দ্র করে সরকারের আরও যে সমস্ত পদক্ষেপ নেওয়া উচিত ছিল সরকার সে-সবদিকে খুব একটা মন দেয়নি।

ইতিমধ্যে, অন্যান্য কিছু সমস্যাও মাথা-চাড়া দিয়েছে। প্রায় সব উপকরণের বাজারের ওপর সরকারি নিয়ন্ত্রণ কমে যাওয়ায় চাষের খরচ বাড়ছে দ্রুত। অন্য দিকে, সরকারের সঙ্কোচন ফসলের বাজারকে দারুণভাবে অনিশ্চিত করে তুলছে। তা ছাড়া সবুজ বিপ্লবের কুফলগুলো প্রকট হতে থাকলেও ছোট চাষির একার পক্ষে পুরনো পদ্ধতিতে ফিরে যাওয়া কিংবা গবেষণার মাধ্যমে উন্নততর জৈব-উপকরণ তৈরি করে ব্যবহার করা সম্ভব হচ্ছে না। ক্ষুদ্র-চাষি ছোট্ট জমি নিয়ে হাঁস-ফাঁস করছে। জমি যেন তার কাছে দায়। অথচ এই জমির খিদে মেটাতেই একদিন সে সরকারি দলে নাম লিখিয়েছিল। তার জীবন-জীবিকার জন্য সরকারের ওপরই সে এতদিন নির্ভর করেছিল।

কিন্তু কেন এমন হল? উন্নয়ন- মডেলের মধ্যেই কি কোনও বড় গলদ ছিল? জমির পুনর্বণ্টনের মধ্যে দিয়ে কি শুধুই তাৎক্ষণিক সমাধান খোঁজার চেষ্টা হয়েছিল? তা যদি না হয়, তবে সমস্ত উপকরণের জোগান, বাজারের সমস্যা, বিশেষত প্রযুক্তি আর উৎপাদনশীলতার প্রশ্নগুলো তেমনভাবে ভাবা হল না কেন? আর ধীরে ধীরে এসব কিছুই বা কেন খোলা বাজারের সামনে ছেড়ে দেওয়া হল? বিশেষ করে বিশ্বায়িত অর্থনীতির সাপেক্ষে অসংখ্য ক্ষুদ্র চাষি নিয়ে গড়ে ওঠা কৃষির অবস্থান কী হবে, এই বিশ্বায়নের যুগে ভূমিসংস্কারের প্রাথমিক সাফল্যকে কীভাবে আরও সুসংহত করা যাবে এ-সব নিয়ে গভীর আলোচনা-বিতর্ক আমরা দেখতে পেলাম না কেন?

আমরা তাত্ত্বিকভাবে জানি যে, জমির পুনর্বণ্টনমূলক ভূমিসংস্কার একেবারেই একটা অন্তর্বর্তী ব্যবস্থা— উন্নয়নের একটা গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু প্রাথমিক পদক্ষেপ মাত্র। কখনওই তা স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। এই পর্যায়ের দুটো পরিণতি হতে পারে। এক, যা আমরা দেখছি। ছোট ছোট অসংখ্য চাষি ক্রমশ কোণঠাসা হয়ে পড়ছে। এর অবধারিত পরিণতি ছোট চাষির জমি হারানো আর তার মধ্যে দিয়ে বড় বড় খামারের জন্ম। অথচ দ্বিতীয় একটা পথও ছিল।

এই দ্বিতীয় পথটা সমবায়ের পথ। অনেকে মিলে একসঙ্গে উপকরণ সংগ্রহ — যন্ত্র ব্যবহার, আর বাজার খোঁজার কাজ। সকলে মিলে উদ্বৃত্ত তৈরি করা আর তার বিনিয়োগ। অর্থাৎ, সমবায় ভিত্তিক উৎপাদন-বণ্টন আর বিনিয়োগের উপর নির্ভর করে উন্নয়নের পথ। এরকম অসংখ্য সমবায় তৈরি করা — সমবায়ের শৃঙ্খল, যা একটা বড় শক্তি হয়ে ওঠে বিশ্ববাজারের ব্যক্তি পুঁজির নিয়ন্ত্রণকে চ্যালেঞ্জ করতে পারে। কিন্তু সে সব করা হয়নি। অথচ বলা হচ্ছে, 'অন্য পথ' ভাবতে হবে, ও পথে নাকি হবে না। অন্য পথের অভিজ্ঞতাও এমনই হবে না তো!

লেখক বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতির অধ্যাপক

শিল্পায়ন, খাদ্য-নিরাপত্তা নিয়ে সংশয়, ডান-বামে ভেদ নেই

সৌম্য চক্রবর্তী

এ-মুহূর্তে রাজ্যজুড়ে কৃষিজমির ব্যাপক রূপান্তর সঙ্গত কারণেই বিতর্ক তৈরি করেছে। গত দু'দশকের বেশি সময় ধরে রাজ্যে যখন কৃষিই তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি গুরুত্ব পেয়েছে, যখন ভূমিসংস্কারকে সরকারের সবচেয়ে বড় সাফল্য হিসাবে দেখানো হয়েছে, তখন হঠাৎ করে এই দিক পরিবর্তন তো প্রশ্ন তুলবেই। বিশেষ করে, রাজ্যের এক বিশাল অংশের মানুষ এখনও চাষের উপর কোনও না কোনওভাবে নির্ভরশীল হওয়ায় দ্রুত চলতে থাকা এই রূপান্তর খানিকটা আতঙ্কেরই সৃষ্টি করেছে।

জমি হারানোর ভয়—স্বাধীন জীবিকা হারানোর সম্ভাবনা, কৃষি-মজুরের কাজ হারানোর আশঙ্কা কিংবা কৃষির সঙ্গে যুক্ত অকৃষি ক্ষেত্রের সঙ্কোচন নিরাপত্তাহীনতা তৈরি করছে। এর সঙ্গেই উঠে আসছে খাদ্য-নিরাপত্তার প্রশ্নটাও।

অসংখ্য ছোট/মাঝারি জোত নিয়ে গড়ে ওঠা এ-রাজ্যের কৃষির একটা সাফল্যের দিক হল, খাদ্য-নিরাপত্তার অনেকটা নিশ্চয়তা। অন্তত সরকারি বক্তব্য সেটাই। ছোট/মাঝারি জোতের উপর নির্ভরশীল বহু

মানুষের সারা বছরের খাদ্যের চাহিদাটুকু ওই জমি থেকেই মিটে যায়। ছোট চাষি কিংবা বর্গাদার নিত্য প্রয়োজনীয় বেশ কিছু ফসল নিজেই তৈরি করে নিতে পারে। এ ছাড়া চাষ শ্রমনিবিড় হওয়ায়, বড় সংখ্যায় কৃষি-শ্রমিকের কর্মসংস্থান আর তাদের খাদ্যের জোগানও ওই জমি দিয়েই হয়। অর্থাৎ, ব্যক্তিগত স্তরে খাদ্য নিরাপত্তা অনেকটাই নিশ্চিত করা যায় জমির সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগ ঘটিয়ে।

কিন্তু আশ্চর্যের কথা হল, সরকারের নতুন উন্নয়ন ভাবনায় এই খাদ্য-নিরাপত্তার বিষয়টা যথেষ্ট গুরুত্ব পাচ্ছে না। এর কারণ সম্ভবত এটাই যে, উন্নয়নের কেন্দ্র বা উদ্দেশ্যটাই বদলে গিয়েছে। কৃষি, কৃষির সঙ্গে যুক্ত অসংখ্য মানুষ আর তাদের নিরাপত্তার প্রশ্নটা যেন তত গুরুত্বপূর্ণ নয়।

অবশ্য সরকারি বক্তব্যটা অন্যরকম। সরকার বলছেন, কৃষির সঙ্গে যুক্ত মানুষের উন্নতির জন্যই না কি শিল্পায়ন দরকার। শিল্পায়ন না কি কৃষির এতদিনকার উন্নতিকেই আরও সুসংহত করবে। কিন্তু কৃষির সঙ্গে যুক্ত অসংখ্য মানুষের খাদ্য-নিরাপত্তার ভবিষ্যৎ নিয়ে সরকারি বক্তব্য কি যথেষ্ট স্পষ্ট? কৃষিজমির রূপান্তর যে ব্যাপক উচ্ছেদ ঘটাবে, ব্যাপকভাবে তৈরি হবে খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা। অথচ, কতকগুলো ভাসা-ভাসা দাওয়াই ছাড়া কোনও সার্বিক পরিকল্পনা আমরা সরকারি বক্তব্যে পাচ্ছি না।

জমি থেকে উৎখাত হওয়া চাষি আর তার সঙ্গে কাজ হারানো খেত-মজুরের খাদ্য-নিরাপত্তা কি যথেষ্ট সুরক্ষিত! জমির সঙ্গে চাষের সঙ্গে সম্পূর্ণ সম্পৃক্ত থাকা অবস্থায় তার খাদ্যের নিশ্চয়তা, আর, শিল্পের শ্রমিক/শহরের ঠিকে মজুর কিংবা অসংগঠিত ক্ষেত্রের অতিক্ষুদ্র ব্যবসায়ী হিসাবে খাদ্য-নিরাপত্তা নিশ্চয়ই এক নয়। প্রথম ক্ষেত্রে যখন নিজের ন্যূনতম প্রয়োজনটুকু মেটানোর খানিকটা সুযোগ নিজের হাতেই থাকে, দ্বিতীয় অবস্থায় খাদ্য-নিরাপত্তা কিন্তু অনেকটাই পরনির্ভরশীল।

একদিকে যেমন তা নির্ভর করে অকৃষি ক্ষেত্রে কাজের সুযোগ, মজুরি ও আয়ের উপর, অন্যদিকে, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হল ফসলের জোগান ও তার দাম। এই সবেরই যে নিশ্চয়তা থাকবে, এমন নয়। বাজারের ওঠা-নামা দিয়েই তা অনেকটা ঠিক হয়।

জমি থেকে উৎখাত হওয়া মানুষের খাদ্য-নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে গেলে বাজারে কাজ থাকতে হবে, সে-কাজে যথেষ্ট আয় পেতে হবে এবং সব শেষে, বাজারে সস্তা ফসলের যথেষ্ট জোগান থাকা চাই। এতগুলো ধাপ পেরিয়ে তবেই খাদ্যের নাগাল পাওয়া সম্ভব। উল্টোদিকে, চাষি/বর্গাদার এমনকী খেতমজুরের এই বাজার-নির্ভরতা অনেকটাই কম। কারণ, তারা জমির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত।

বাজার যখন যথেষ্ট নির্ভরযোগ্য একটা প্রতিষ্ঠান নয়, তখন খাদ্যের মতো একটা অত্যন্ত জরুরি বিষয়কে বাজারের হাতে ছেড়ে দেওয়া কি যথেষ্ট দায়িত্বশীল কাজ! দরিদ্র দেশে, যেখানে বেশিরভাগ মানুষের ব্যক্তিগত সম্বল খুবই কম, সেখানে বাজারের খামখেয়ালিপনা মারাত্মক অবস্থা তৈরি করতে পারে, সে তো আমরা জানি।

অন্যদিকে, রাজ্যের সার্বিক খাদ্য-নিরাপত্তার প্রশ্নটাও কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ। এ-ক্ষেত্রে সরকারি বক্তব্য তো এটাই যে-রাজ্যে মোট খাদ্যের যা প্রয়োজন তা না কি এ-রাজ্যেই তৈরি হচ্ছে। কিন্তু এ-দাবি তর্কাতীত নয়। এই প্রয়োজন তো আসলে বাজারের চাহিদা। অথচ, একটা বড় অংশের মানুষই এই বাজার-ব্যবস্থার বাইরে। তাই তাদের প্রয়োজনটা ওই চাহিদায় ধরা পড়ে না। রাজ্যে তৈরি হওয়া মোট খাদ্য যদি সবার মধ্যে প্রকৃত প্রয়োজন অনুসারে ভাগ করা যায়, বিশেষ করে, দারিদ্র-সীমার নিচে থাকা বিপুল সংখ্যক মানুষকে যদি এই হিসাবের মধ্যে আনা যায়, তবে কি সত্যিই খাদ্য উৎপাদন যথেষ্ট বলা যাবে? এর উপর আবার জমির রূপান্তর কি সমস্যা তৈরি করবে না?

সরকারের তরফে এ-বিষয়ে দুটো পথ বাতলানো হচ্ছে। এক, পতিত জমিকে সুজলা-সুফলা করা; দুই, প্রয়োজনে অন্য রাজ্য থেকে খাদ্য আমদানি। প্রথম দাওয়াইয়ের পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, ওই পথ অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য, তার দায়িত্ব কে নেবে? বেসরকারি সংস্থা নিশ্চয়ই সেই বিশাল দায়িত্ব নেবে না। আর সরকার যদি সেই ভার নেয়, তবে প্রশ্ন ওঠাই স্বাভাবিক, ওই বিপুল পরিমাণ অর্থ সরকার শিল্পেই বা ঢালছে না কেন? বহু-ফসলি জমি বেসরকারি বড় পুঁজির হাতে তুলে দিয়ে সরকারকে কেন এই ব্যাপক ব্যয়ভার বহন করতে হবে পতিত জমিকে চাষযোগ্য করতে? মনে রাখা দরকার, বড় পুঁজির মূল উদ্দেশ্য মুনাফা অর্জন, খেটে খাওয়া মানুষের কম দামি শস্যের প্রয়োজন মেটানো নয়।

আর দ্বিতীয় সমাধান সম্পর্কে এটুকুই বলার, সারা দেশ জুড়েই আসলে একই রূপান্তর প্রক্রিয়া চলছে—ডান-বামে কোনও ভেদ নেই। তাই সমস্যাটা শুধু পশ্চিমবঙ্গের নয়, সারা দেশের। সে-ক্ষেত্রে অন্য রাজ্য থেকে খাদ্য আমদানির পথ বন্ধ। সব রাজ্যেই তো খাদ্য-সমস্যা দেখা দিতে পারে। ফলত, সারা দেশের খাদ্য-নিরাপত্তাও সংশয়াতীত নয়।

লেখক বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতির অধ্যাপক

সম্পাদকীয়

হাজার হাজার কোটি টাকার কারখানায় কাজ করেন ৮৩০ জন

সৌম্য চক্রবর্তী

পশ্চিমবঙ্গ সরকার রীতিমতো বিজ্ঞাপন দিয়ে প্রচার করছে, চলতি শিল্পায়ন প্রক্রিয়ায় শুধু শহরের ছেলে-মেয়েরাই চাকরি পাবে না, গ্রামের ছেলে-মেয়েদেরও একটা হিল্লে নাকি হবেই। বড় শিল্পের সঙ্গেই গড়ে উঠবে অসংখ্য ছোট প্রতিষ্ঠান আর তার সঙ্গে বিস্তৃত হবে অসংগঠিত ক্ষেত্র। তাই সব মিলিয়ে আগামী দিনে অনেকটাই বেকারত্ব কমবে। এমনটাই দাবি করছে রাজ্য সরকার।

গত বছর দশেকের অভিজ্ঞতা কিন্তু অন্য কথা বলছে। রাজ্য সরকারের 'নয়া শিল্পনীতি' চালু হওয়ার পর গত ১২ বছরে পশ্চিমবঙ্গে সরাসরি বিনিয়োগ হয়েছে প্রায় ৩০ হাজার কোটি টাকা, কিন্তু তাতে কর্মসংস্থান হয়েছে মাত্র ৬০ হাজার। সেই ট্র্যাডিশন এখনও চলেছে। সালিম গোষ্ঠীর প্রাথমিক প্রকল্পের প্রস্তাবিত বিনিয়োগের পরিমাণ ৪৪ হাজার কোটি টাকা, অথচ কর্মসংস্থান হবে নাকি ৩০ হাজার মানুষের। গত সপ্তাহের খবরে প্রকাশ, হাওড়া জেলায় ১০ হাজার হেক্টর জমি (অবশ্যই কৃষিজমি) অধিগ্রহণ করা হতে পারে। মাছ চাষের জন্য, আর তাতে সব মিলিয়ে কাজ পেতে পারেন ৩০ হাজার মানুষ।

এ সব শুনতে শুনতে পুরনো একটা অভিজ্ঞতার কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। বছর চার-পাঁচ আগে আমার আগের কর্মক্ষেত্র সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের অর্থনীতি বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে আমরা গিয়েছিলাম হলদিয়া পেট্রোকেমিক্যালস পরিদর্শনে। সে-সময় হলদিয়া পেট্রোকেমিক্যালসকে হাজির করা হচ্ছিল রাজ্য সরকারের সাফল্যের প্রতীক হিসাবে। তাই ছাত্র-ছাত্রীদের তা দেখাতে নিয়ে যাওয়া। অত্যাধুনিক প্রযুক্তি আর পরিচালন-ব্যবস্থা সত্যিই তাক লাগানোর মতো। তবে উন্নয়নের অর্থনীতির পাঠ নেওয়া ওই ছাত্র-ছাত্রীরা নিতান্তই হতাশ হয়েছিল এটা শুনে যে, ওই বিশাল কয়েক হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগের কারখানায় কাজ করেন নাকি মাত্র ৮৩০ জন! বিশ্বাসযোগ্য নয়, তাই না? আমরা বিশ্বাস করতে চাইনি। তবে সংশ্লিষ্ট অফিসার আমাদের বারেবারে অত্যন্ত গর্বিতভাবে বলেছিলেন, এটা আদ্যিকালের কারখানা নয় যে হাজার হাজার 'কালিঝুলি-মাখা শ্রমিক' কারখানাটা চালাবেন।

আর একটা অভিজ্ঞতার কথা বলার লোভ সামলাতে পারছি না। পাঠক ক্ষমা করবেন। কয়েক সপ্তাহ আগে একটা বিশেষ প্রয়োজনে বক্রেশ্বর তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের এক অধিকর্তাকে যোগাযোগ করে জানা গেল ওই কারখানায় বর্তমানে কর্মী আছেন ৪৮০ জন। সেই বক্রেশ্বর কারখানা—যা নাকি অসংখ্য মানুষের রক্তের বিনিময়ে তৈরি।

ছবি : শান্তনু দে

আসলে এমনটাই তো হওয়ার কথা। চলতি শিল্পায়ন প্রক্রিয়া বড় পুঁজি আর আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর। সেখানে কর্মসংস্থানের সুযোগ যে খুবই কম। প্রত্যক্ষ কর্মসংস্থানের হিসাব নিলে দেখা যাচ্ছে, এক কোটি টাকা বিনিয়োগে হয়তো গড়ে একজনের চাকরি জুটবে। যদি ধরেও নিই, বড় শিল্পে একজনের প্রত্যক্ষ কর্মসংস্থান মানে বড় শিল্পের সঙ্গে নানাভাবে যুক্ত অসংগঠিত ক্ষেত্রে দশ জনের কাজের সুযোগ (সেটা হয়তো সর্বোচ্চ সীমা), তবে এই প্রক্রিয়ায় এক কোটি টাকা বিনিয়োগে নতুন চাকরি হবে ১০/১২ জনের।

পশ্চিমবঙ্গে শুধুমাত্র নথিভুক্ত (রেজিস্টার্ড) শিক্ষিত বেকারের সংখ্যাই ৭৫ লক্ষ। এর বাইরেও বিপুল অংশ মানুষের কাজ নেই। তার হিসাব সরকারি পরিসংখ্যানে মেলে না। এই বিশাল বেকার-বাহিনীর তুলনায় প্রস্তাবিত কর্মসংস্থান নগণ্যই। অথচ বিপুল পরিমাণ সম্পদ ব্যয় হচ্ছে। তার সঙ্গে সঙ্গেই চাষের জমির উপর কোপ পড়ছে; উন্নয়নের নামে ব্যাপক উচ্ছেদ চলছে গ্রাম-শহর সর্বত্রই।

প্রথমত, মোট কাজের সুযোগ যা তৈরি হবে তা সমস্যার ব্যাপকতার তুলনায় নগণ্য। দ্বিতীয়ত, বড় শিল্পে প্রত্যক্ষ কর্মসংস্থানের 'পুরস্কার' জুটবে সামান্য কিছু লোকের। বাকি অংশটার একমাত্র ভরসা অত্যন্ত অল্প আয়ের অসংগঠিত ক্ষেত্র। মনে রাখা দরকার, এই অসংগঠিত ক্ষেত্র আমাদের দেশের বহুদিন ধরে গড়ে ওঠা সনাতন ক্ষেত্র নয়, বরং হঠাৎ শিল্পায়নের প্রয়োজনে তৈরি হওয়া একটা অনুসারী ক্ষেত্র মাত্র। দুই ক্ষেত্রের ফারাক বিরাট। আর তথ্য এটাই বলছে।

সংগঠিত ও অসংগঠিত ক্ষেত্রের মধ্যে বৈষম্য ক্রমশই বেড়ে চলেছে। এটা ঘটছে সব অনুন্নত দেশেই। ভুঁইফোঁড় অসংগঠিত ক্ষেত্রে যুক্ত হওয়া অসংখ্য মানুষের ভবিষ্যৎ একেবারেই অনিশ্চিত। অথচ আশ্চর্যের বিষয় হল পুঁজি-নিবিড় বড়/আধুনিক শিল্প আর তার সঙ্গে সরাসরি যুক্ত তথাকথিত শিক্ষিত উচ্চবিত্ত মানুষের অগ্রগতি সম্পর্কে সরকার যথেষ্ট মনোযোগী হলেও, অসংগঠিত ক্ষেত্রে যুক্ত বিশাল সংখ্যক মানুষকে নিয়ে চিন্তা সরকারি উন্নয়ন মডেলে তেমন ভাবে পাওয়া যাচ্ছে না। অনেকটা দায়সারা ভাবেই যেন সরকার 'উদ্বৃত্ত জনসংখ্যা'কে অসংগঠিত ক্ষেত্রের দিকে ঠেলে দিতে চাইছে।

লেখক, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতির অধ্যাপক

অর্থনীতি

ছবি : শান্তনু দে

আমাদের 'কৃষিভিত্তি' কি যথেষ্ট শক্তপোক্ত

সৌম্য চক্রবর্তী

ভূমি সংস্কার/'অপারেশন বর্গা' আর ১৯৮০/৯০-এর উৎপাদন বৃদ্ধির পরবর্তী সময়ে পশ্চিমবঙ্গের কৃষি অনেক সমস্যার সামনে এসে পড়েছে। অপারেশন বর্গার প্রাথমিক সাফল্য, আর একটা বড় সময় ধরে জমির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির ওপর নির্ভর করে পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতিতে কৃষিক্ষেত্র একটা বিশেষ স্থান অধিকার করে ছিল। রাজ্য সরকারের রাজনৈতিক সাফল্যের অন্যতম হাতিয়ার হিসেবে দেখানো হত কৃষির এই সব সাফল্যকে। কিন্তু গত কয়েক বছর যাবৎ চাকাটা হঠাৎ যেন উল্টোদিকে ঘুরছে। সরকারের গুরুত্বের তালিকায় কৃষির স্থানটা যেন একটু নেমে গিয়েছে।

এর একটা কারণ হয়তো এটাই যে, এখন কৃষি আর তেমন আয় দিতে পারছে না—ব্যক্তিগত স্তরেও না, সার্বিকভাবে রাজ্যের আর্থিক উন্নতিতেও না। অপারেশন বর্গা পরবর্তী ব্যাপকতর ভূমি-সংস্কারের অভাব (মনে রাখতে হবে '৭৭ পরবর্তী বামফ্রন্ট জমানায় মাত্র ৬.৭৮ লক্ষ হেক্টর জমির ওপর বর্গাদারের অধিকার চিহ্নিত হয়, যা রাজ্যের মোট কৃষিযোগ্য জমির মাত্র ১৪.৩৮ শতাংশ), দীর্ঘমেয়াদি সমবায়ভিত্তিক অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের অনিচ্ছা, কিংবা কেন্দ্রীয় সরকারের বাজারমুখী নীতি, যে কোনও কারণেই হোক পশ্চিমবঙ্গের কৃষি-অর্থনীতি বিপজ্জনক অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে।

এক দিকে জোতের গড় আয়তন কমছে, তার সঙ্গে কমছে জমির উর্বরাশক্তি, অন্যদিকে, চাষের খরচ যদিও হু-হু করে বাড়ছে, ফসলের দাম তেমনভাবে পাওয়া যাচ্ছে না। অসংখ্য ছোট-মাঝারি চাষির ব্যক্তিগত দক্ষতা-উদ্যম আর ক্ষমতার ওপর নির্ভরশীল রাজ্যের কৃষি সঠিক দিশার অভাবে সত্যিই ধুঁকছে। তার প্রাথমিক সাফল্য দ্রুত হারিয়ে যাচ্ছে।

১৯৮০/৯০-এর কৃষি সাফল্যের মূল উৎসই ছিল রাজ্যের ছোট চাষি। অথচ কী আশ্চর্য, এদের সংখ্যাই নাকি দ্রুত কমছে। আর গ্রামীণ ভূমিহীন পরিবারের সংখ্যা বাড়ছে! যেখানে ১৯৯১ সালে চাষির সংখ্যা ছিল গ্রামীণ জনসংখ্যার ৩৮.৪ শতাংশ, ২০০১ সালে ১৩ শতাংশ (!!) কমে তা হয়েছে ২৫.৪ শতাংশ। কোথায় গেলেন এঁরা? এঁদের একটা অংশ কৃষি-শ্রমিকে পরিণত হয়েছেন, যদিও সার্বিকভাবে গ্রামীণ জনসংখ্যায় কৃষি-শ্রমিকের অনুপাত বেড়েছে খুবই কম (৩২.৩ শতাংশে থেকে ৩৩ শতাংশ, ১৯৯১-২০০১ এই সময়ে)। তা হলে? গ্রামীণ জনসংখ্যার এক ব্যাপক অংশ চলে গিয়েছে কৃষিকাজ ছেড়ে দিয়ে গ্রামীণ অকৃষি ক্ষেত্রে। গ্রামীণ অকৃষি ক্ষেত্রের জনসংখ্যার অনুপাত ২৯.৩ শতাংশ। (১৯৯১) থেকে বেড়ে হয়েছে ৪১.৬ শতাংশ (২০০১)। যাঁরা চাষ ছেড়েছেন, তাঁদের একটা বিরাট অংশ গ্রামের অকৃষি ক্ষেত্রে ছোটখাটো ব্যবসা কিংবা মজুরের কাজ করছেন।

সব মিলিয়ে দেখা যাচ্ছে, চায় আর তার সঙ্গে যুক্ত কৃষি-শ্রমিকের কাজের অনুপাত কমেছে। অর্থাৎ, গ্রামীণ অর্থনীতিতে চাষবাস সংক্রান্ত কাজের গুরুত্ব কমেছে। মানুষ বাধ্য হয়ে অন্য পথ খুঁজে নিচ্ছেন অকৃষি ক্ষেত্রে, যদিও সে-পথে ঝুঁকি—অনিশ্চয়তা প্রচুর। ভূমি সংস্কারের ফসল যে 'কৃষিভিত্তি' তা গ্রামীণ মানুষকে তেমন ভরসা দিতে পারছে না। যুক্তি হিসেবে বলা যেতে পারে, কাজের এই 'বৈচিত্রায়ণ' কৃষি সাফল্যেরই পরবর্তী পর্যায়, তা কৃষি সাফল্যেরই ফসল। তাই যদি হবে, তা হলে বিপুল অংশ মানুষ চাষবাস ছাড়ছেন কেন? সামান্য সম্বল জমিটুকু—খাদ্য-নিরাপত্তাটুকু বাজারের হাতে ছেড়ে দিচ্ছেন কেন? কৃষিভিত্তি কি টলে গিয়েছে!

অথচ সমস্যা হল, রাজ্যের জনসংখ্যার একটা বিপুল অংশ এখনও গ্রামেই বাস করেন, গ্রামের অর্থনীতির ওপরই তাঁরা নির্ভরশীল। এঁরা গ্রামে ছেড়ে শহরে এলে কী সমস্যা মিটত? সেখানে কাজের সুযোগ কী পাওয়া যেত না! তথ্য বলছে, সংগঠিত ক্ষেত্রে শ্রমিকের অনুপাত, ১৯৯১-২০০১ এই সময়ে, ১২ শতাংশ থেকে কমে হয়েছে ৮.৭ শতাংশ! আর এই হ্রাস সবচেয়ে বেশি ঘটেছে কলকাতায়। তারপর ঘটেছে উত্তর ২৪ পরগনা, হাওড়া ও বর্ধমানে। অর্থাৎ, শহরের সংগঠিত ক্ষেত্রে কাজের সুযোগ কমেছে।

শহরের অসংগঠিত ক্ষেত্রের অবস্থা কেমন? শহরের কর্মক্ষম মানুষের প্রায় ৬০ শতাংশই অসংগঠিত ক্ষেত্রে কাজ করেন। কিন্তু বাম-রাজত্বে, এই ক্ষেত্রে মজুরি সর্বভারতীয় গড়ের থেকে কম! আবার তা ন্যূনতম মজুরির থেকেও নিচে! তাই গ্রামের মানুষের পক্ষে শহরে সম্মানজনক কাজ পাওয়া খুবই কঠিন।

● **লেখক বিশ্বভারতীর অর্থনীতির অধ্যাপক**

অর্থনীতি

ছবি : দেবনাথ নন্দী

শিল্পায়নের ধাক্কায় 'কৃষিভিত্তি' কি 'ফালতু' হয়ে গেল

সৌম্য চক্রবর্তী

রাজ্যের কৃষি সমস্যাগুলির সমাধানের অন্যতম উপায় হিসাবে হাজির করা হচ্ছে চলতি শিল্পায়ন প্রক্রিয়াটাকে। শুধু শিল্পের জন্যই শহরের জন্যই-শিল্প নয়, বলা হচ্ছে, গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নতির জন্যও নাকি এই শিল্পায়ন জরুরি। শিল্প হলে কর্মস্থান হবে, ফলে কৃষির 'উদ্বৃত্ত জনসংখ্যা', যাদের কৃষিক্ষেত্রে কাজ জোটেনি বা জুটলেও তা থেকে আয় খুবই কম, তাদের একটা হিল্লে হবে। বড়/'আধুনিক' শিল্পে না হোক, অনুসারী অসংগঠিত ক্ষেত্রে অন্তত একটা চাকরি না কি জুটবেই। একদিকে বাড়তে থাকা চাষের খরচের চাপ, আর অন্যদিকে ফসলের বাজারের অভাবে হাঁসফাঁস করা ছোট চাষি জমি বেচে দিয়ে কল কারখানার শ্রমিক বা অসংগঠিত ক্ষেত্রে ছোট ব্যবসায়ী হবে।

শিল্পায়নের অন্য একটা গুরুত্বের কথাও বলা হচ্ছে। শিল্পে কর্মসংস্থান হলে, অকৃষি ক্ষেত্রে আয় বাড়বে। ফলে, সেখানে খাদ্যের অতিরিক্ত চাহিদা তৈরি হবে। তার মানে কৃষি পণ্যের, বিশেষত, খাদ্যশস্যের বাজারের সম্প্রসারণ। এভাবে ফসলের দাম বাড়লে চাষির আয়ও বৃদ্ধি পাবে। চাষি উৎপাদন বাড়াতে উৎসাহিত হবে, আর তার সঙ্গেই কৃষিতে কর্মসংস্থানও বাড়বে। এই শিল্পায়ন কৃষি উন্নয়নেও অনুঘটকের ভূমিকাপালন করতে পারে।

কিন্তু উন্নয়নের অর্থনীতির এই সরল তত্ত্বটা পৃথিবীর বহু উন্নয়নশীল দেশেই প্রয়োগ করার চেষ্টা হয়েছে, আর প্রায় প্রতিটা ক্ষেত্রেই তা অসফল। আমাদের রাজ্যে ওই তত্ত্বের যে প্রয়োগের চেষ্টা হচ্ছে তাতেও কতকগুলো সমস্যা আছে।

প্রথমত আমাদের এই শিল্পায়ন প্রক্রিয়া বড় পুঁজি আর আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর। তাই সেখানে কর্মসংস্থানের সুযোগ যথেষ্ট নয়। অনুসারী অসংগঠিত ক্ষেত্রে কাজের সুযোগগুলো হিসেবের মধ্যে আনলে সংখ্যাটা বড় মনে হলেও যে সমস্যার সমাধান হিসেবে এটাকে হাজির করা হচ্ছে, অর্থাৎ গ্রাম-শহরের ব্যাপক বেকারত্ব, তার তুলনায় এটা নগণ্য। অথচ বিপুল পরিমাণ সম্পদ ব্যয় হচ্ছে। তার সঙ্গে সঙ্গেই চাষের জমির ওপর কোপ পড়ছে, উন্নয়নের নামে ব্যাপক উচ্ছেদ চলছে গ্রাম-শহর সর্বত্র-ই।

দ্বিতীয়ত, বড় শিল্পে প্রত্যক্ষ কর্মসংস্থানের 'পুরস্কার' জুটবে সামান্য কিছু লোকের। বাকি অংশটার একমাত্র ভরসা অত্যন্ত অল্প আয়ের অসংগঠিত ক্ষেত্র। মনে রাখা দরকার, এই অসংগঠিত ক্ষেত্র আমাদের দেশের বহুদিন ধরে গড়ে ওঠা সনাতন ক্ষেত্র নয়, বরং হঠাৎ শিল্পায়নের প্রয়োজনে তৈরি হওয়া একটা অনুসারী ক্ষেত্র মাত্র। যে ক্ষুদ্র-প্রান্তিক চাষি বা খেত মজুর এখন ধুঁকছে, এই অসংগঠিত ক্ষেত্রে যুক্ত হয়ে তার অবস্থার কতটা উন্নতি হবে তা সহজেই অনুমান করা যায়। বড় কারখানার কাজ পেতে গেলে যে বিশেষ ধরনের দক্ষতা দরকার তা এদের নেই, এদের দক্ষতা তো সম্পূর্ণ অন্যরকম—এক অন্যরকম ঐতিহাসিক প্রক্রিয়াজাত। দীর্ঘ দিনের চাষের কাজের দক্ষতা বর্জন করে এরা হঠাৎ ভুঁই-ফোঁড় অসংগঠিত ক্ষেত্রে যুক্ত হবে। এই উচ্ছেদের সামাজিক -সাংস্কৃতিক- অর্থনৈতিক ক্ষতিটা কিন্তু কম নয়।

অন্যদিকে, আর একটা সমস্যাও আছে। আমরা জানি, সরকার বলছেন, শিল্পায়ন হলে কর্মসংস্থান হবে। ফলে, শস্যের বাজার বাড়বে, কৃষির উন্নতি হবে। কিন্তু কতটুকু সেই কর্মসংস্থান? কতটুকুই বা খাদ্যের নতুন চাহিদা তৈরি হবে? যে অংশ মানুষ অসংগঠিত ক্ষেত্রে যুক্ত হবে তাদের আয় যে যথেষ্ট বাড়বে না তা বলাই বাহুল্য।

আর বড় কারখানায় যারা চাকরি পাবে—অর্থাৎ দক্ষ শ্রমিক, তাদের আয়ের খুব অল্প অংশই তো ব্যয় হয় খাদ্যে। সেটাও আবার দামি শস্য-ফল-সবজি এসবের পেছনেই খরচ হয়। এই সব দামি শস্য তৈরি করতে পারে একমাত্র বড় চাষি, যাকে নিজের খাদ্য নিরাপত্তা নিয়ে ভাবতে হয় না, যার যথেষ্ট মুলধন আছে, ফসল সংরক্ষণ-পরিবহন-বিপণনের যোগাযোগ আছে। ছোট চাষির সে সব কিছুই নেই। এই সব ফসল চাষ করতে গেলে তাকে চুক্তি-চাষে যুক্ত হতে হবে। অর্থাৎ, শিল্পায়ন বড় চাষির বা কৃষিপণ্যের বড় কারবারির আয় বাড়ালেও ক্ষুদ্র-প্রান্তিক চাষি আর খেতমজুরের তাতে লাভ সামান্যই।

আসলে এই শিল্পায়ন একদিকে শিল্পপতি, বড় চাষি, কৃষি পণ্যের বড় কারবারি আর তার সঙ্গে কিছু দক্ষ শ্রমিকের প্রভূত উন্নতি ঘটাবে। অথচ অন্যদিকে, ক্ষুদ্র প্রান্তিক চাষি খেতমজুর কিংবা অসংগঠিত ক্ষেত্রে যুক্ত অসংখ্য মানুষের সমষ্টি অনেক নিচেই পড়ে থাকবে।

(লেখক বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক)

কাজ করলেই ফল মিলবে, কথাটা সবার ক্ষেত্রে খাটে না

সৌম্য চক্রবর্তী

অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গ পিছিয়ে পড়েছে। তার একটা বড় কারণ না কি বাঙালির কর্ম-বিমুখতা। তাই কর্ম-সংস্কৃতি কীভাবে তৈরি করা যায় তা নিয়ে জোর আলোচনা চলছে। সরকারি ক্ষেত্রে শ্রমিক-কর্মচারী-ডাক্তার-মাস্টার সবাইকেই 'ফাঁকিবাজি' বর্জন করে পরিশ্রম ('পারফর্ম') করতে বলা হচ্ছে; না হলে চাকরি নিয়ে টানাটানি হতে পারে।

তবে সবচেয়ে বড় কথা, সরকার বলছে প্রত্যেককে তার নিজের কাজ নিজেকেই খুঁজে নিতে হবে। বেকারত্ব ঘোচানোর দায় শুধু সরকারের নয়। কর্মকুশলতা দেখাতে পারলে বেসরকারি সংগঠিত, অসংগঠিত ক্ষেত্রে কাজ জুটবে। আর সঙ্গে চাই প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার লড়াই।

বলা হচ্ছে, কর্ম-দক্ষতা দেখাতে পারলেই 'ইনাম' পাওয়া যাবে। মানবিকতা কিংবা সামাজিক সহযোগিতার থেকেও অনেক বেশি দরকারি নির্মম প্রতিযোগিতা। এটাই না কি উন্নয়নের চাবিকাঠি। এতে যেমন সমাজের আর্থিক গতি ত্বরান্বিত হয়, তেমনই পরিশ্রমের পুরস্কারও মেলে।

কিন্তু প্রশ্ন একটা থেকেই যায়। এই পরিশ্রম তো লক্ষ লক্ষ মানুষ প্রতিদিন কতই করছেন, যাকে বলে উদয়াস্ত হাড়-ভাঙা খাটুনি—মাথার ঘাম পায়ে ফেলা। তবু যে কেন তাঁদের যথেষ্ট পারিশ্রমিক জোটে না। রোদে জলে অবিরাম খেটে চাষি ফসল ফলাচ্ছেন, দারুণ দূষিত পরিবেশে বিপদের ঝুঁকি নিয়ে শ্রমিক খাদানে, পাটকলে কিংবা 'মিনি স্টিল' কারখানায় খাটছেন। আরও আছেন বিরাট অসংগঠিত ক্ষেত্রে বাড়ি বাড়ি কাজ করে বেড়ানো 'কাজের-ঝি', রেলের হকার বা কুলি, ফুটপাতের ফেরিওয়ালা, মোটর মেকানিক, বিড়ি শ্রমিক, গ্রাম-শহরের অসংখ্য অতি-ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, দর্জি, মুচি, পটের শিল্পী, ছৌ-শিল্পী, এমন আরও কত লক্ষ মানুষ। যদি কেউ বলেন এঁরা সব ফাঁকিবাজ, তবে সেটা তো ডাহা মিথ্যে কথা। পঙ্গু চা বা পেন বিক্রেতা, তিরিশ বছর ধরে লড়াই চালানো মূক ও বধির বাদাম বিক্রেতা, এঁদের জীবন সংগ্রামের খবর সমাজের স্বঘোষিত ঠিকাদাররা রাখে না।

এই সব খেটে-খাওয়া মানুষরাই তো আমাদের সমাজের সবচেয়ে বড় অংশ। এঁদের পরিশ্রমে তো কোনও ঘাটতি নেই। তবুও তথাকথিত উন্নয়নের ছিটেফোঁটা লাভও তাঁদের ভাগ্যে জোটে না। আর যদি বলা হয়, এঁরা যথেষ্ট দক্ষ নন, তবে সেটাও কিন্তু সত্যি নয়। এই মানুষদের সবাইকেই নিজের নিজের জায়গায় দক্ষতা প্রমাণ করতে করতে চলতে হয়। কাজের মধ্যে থেকেই এঁরা সেই দক্ষতা অর্জন করেন। আমাদের সমাজের সনাতন জ্ঞান তো এদের হাত ধরেই এক প্রজন্ম থেকে আর এক প্রজন্মে বয়ে চলে। একজন চাষি, তাঁতি কিংবা ডোকরা শিল্পী তো আসলে একজন স্রষ্টা। অথচ কী অর্থকরীভাবে কী সামাজিক প্রতিষ্ঠার নিরিখে এরা সমাজের নিচুতলার মানুষ হয়েই থেকে যান। আর বড়লোকের 'উন্নয়ন' বারে বারে এঁদের পিষে মেরে ফেলে।

এটা যেন মস্ত বড় ধাঁধা। ওই যে বলা হচ্ছে কর্মসংস্কৃতির অভাব, তাই

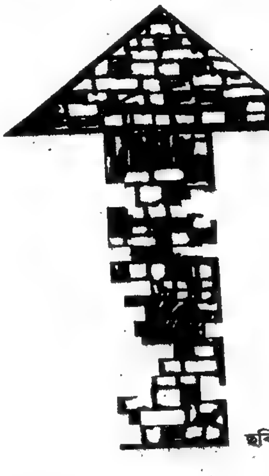

ছবি : শান্তনু দে

আমাদের উন্নতি হচ্ছে না, সে কথাটা অন্তত এই সব মানুষের ক্ষেত্রে খাটে না। সারা জীবন ধরে সমস্ত জীবনীশক্তি খরচ করেও এঁরা যা পান সেটা দিয়ে তো ন্যূনতম দৈনন্দিন প্রয়োজনটুকুও মেটানো সম্ভব নয়।

এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে যাচ্ছে সেই ফল বিক্রেতার কথা যিনি একটা মাত্র হাত-কে সম্বল করে লড়েছেন বহু বছর। ভিন রাজ্য থেকে আসা লম্বা চওড়া মানুষটিকে আমরা দেখতাম ট্রেনের এক কামরা থেকে অন্য কামরায় 'হকারি' করতে। তাঁর জোরালো গলার আওয়াজে কোনও আলস্য ছিল না। অথচ জানেন, এই সে-দিন তাঁকে দেখলাম ভিক্ষে করতে। কারণ জিজ্ঞেস করায় শুনলাম, বয়স হয়েছে, 'কম্পিটিশন' বেড়েছে তাই আর উপায় নেই। আচ্ছা, এই মানুষটা তো হার মানেননি, প্রতিকূলতাকে জয় করার সাহস দেখিয়েছেন। কিন্তু তাঁর এই লড়াই যথেষ্ট ইনাম পেল কই?

অথচ সমাজের উপর তলার মানুষরা বেশিরভাগ সময়ে তুলনামূলকভাবে অনেক কম পরিশ্রমেই ওই ইনাম পেয়ে যান। তর্ক উঠতে পারে, সব কাজ তো এক নয়, কোনওটা উঁচু-দামি কাজ আবার কোনও কাজ সস্তা। তা এই দামি-সস্তা, উঁচু-নিচু ফারাকটা হবে কিসের ভিত্তিতে? একটা মাপকাঠি নিশ্চয়ই আছে। উত্তরে অনেক সময় এটাই বলা হয় যে কর্মদক্ষতাই মাপকাঠি। আবার কখনও সৃষ্টিশীলতা বা সামাজিক প্রয়োজনের কথাও বলা হয়। কিন্তু সে-সব দিয়ে তো সব সময় হিসেব মেলে না।

মাপকাঠি যদি ব্যক্তিগত কর্মদক্ষতা বা পারদর্শিতাই হবে তাহলে সার্কাসে খেলা দেখানো অসাধারণ দেহ সৌষ্ঠবের ছেলে-মেয়েদের তুলনায় 'মডেল-সুন্দরী'-দের দাম এত বেশি হবে কেন? সার্কাসের চাকরি যখন একটা সস্তা পেশা, ঠিক তখনই 'মডেল' হওয়ার জন্য যেন হুড়োহুড়ি পড়ে গিয়েছে। এই তফাতটা আপাত দৃষ্টিতে একটা ধাঁধাই। অন্যদিকে, সামাজিক প্রয়োজনীয়তা যদি মাপকাঠি হয় তবে সভ্যতার জ্বালানি জোগানো কয়লা খনির শ্রমিকের মজুরি আর শিক্ষকের বেতনের মধ্যে এত কুৎসিত ফারাক কেন! আবার সৃষ্টিশীলতার নিরিখে ভারতবর্ষ জুড়ে ছড়িয়ে থাকা অসংখ্য কুটির শিল্পের অসামান্য শিল্পীদের নিদারুণ অবস্থার সঙ্গে সফ্‌টওয়্যারের কারিগরদের প্রাচুর্যকে মেলাই কেমন করে?

কোনও চলতি ধারণা দিয়েই যে এই সব হিসেব মেলানো যায় না। মানুষে মানুষে ফারাক তো থাকবেই। ক্ষমতার ফারাক, প্রয়োজনের ফারাক। তাই পারিশ্রমিকেও তারতম্য কিছুটা হবেই, অন্তত যত দিন না মানুষের শ্রমকে উন্নততর কোনও মানবিক দৃষ্টিতে দেখা হবে। কিন্তু পার্থক্যগুলো যে বড্ড চোখে লাগে। এতটা তফাত কি সত্যিই থাকার কথা? শুধু উদ্যম, পারদর্শিতা, সৃষ্টিশীলতা কিংবা সামাজিক প্রয়োজনের সাধারণ মানদণ্ডে তো মজুরির তারতম্যের এই অঙ্কগুলো মেলে না। তাহলে কেন এত বৈষম্য!

আর সবচেয়ে বড় কথা, কর্ম করলে তার ফল পাওয়া যাবে, একথাটা তো সকলের ক্ষেত্রে সমানভাবে খাটছে না। কেউ সারাটা জীবন উদয়াস্ত পরিশ্রম করে শেষে ভিক্ষে করতে বাধ্য হচ্ছে। কেউ বা মাত্রাতিরিক্ত বিলাসে জীবন কাটাতে পারছে অনেকটাই জন্মসূত্রে সমাজের উপরতলার মানুষ হওয়ার সুবাদে। একবিংশ শতাব্দীতে ভাগ্যের দোহাই দিয়ে তো এই অযৌক্তিক বৈষম্যকে এড়িয়ে যাওয়া যাবে না। আর যুক্তি বা প্রশ্নের উত্তর না থাকলে মানুষ খামোখা মুখে রক্ত তুলে খাটবেই বা কেন?

লেখক বিশ্বভারতীর অর্থনীতির অধ্যাপক

নর চিঠি

পুঁজির মুনাফা তৈরিতে কে কতটা প্রয়োজনীয় তা দিয়েই তার গুরুত্ব

সৌম্য চক্রবর্তী

মাননীয় রেলমন্ত্রী লালুপ্রসাদ যাদব আবার খবরের শিরোনামে। তবে এবার কারণটা একেবারেই অন্যরকম। তিনি এখন "ম্যানেজমেন্ট গুরু"।

লালুপ্রসাদ-কে এই সেদিন পর্যন্তও দেখানো হত এক 'কমিক চরিত্র' হিসাবে। তাঁর কাজ কর্মে না কি অহরহ ভারতীয় রাষ্ট্র ও গণতন্ত্রের মর্যাদাহানি হত। আর শিক্ষিত বাঙালির কাছে তো তিনি ছিলেন নিতান্তই 'দেহাতি' একটা লোক— বিদ্রূপ আর করুণার পাত্র। অথচ, আজ তিনিই না কি ম্যানেজমেন্ট গুরু—উচ্চশিক্ষিত সমাজের প্রিয় পাত্র! উচ্চশিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানে তাঁকে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে। তাঁর কর্মকুশলতা ফলাও করে প্রচার করা হচ্ছে। এমনকী তাঁর স্বেচ্ছাচারকেও কর্মদক্ষতা হিসেব দেখানোর চেষ্টা চলছে।

প্রাথমিকভাবে এসব দেখে তথাকথিত শিক্ষিত সমাজের মুখপত্র/মুখপাত্র-দের মানসিক স্থিরতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠাই স্বাভাবিক। কারণ এই ক'দিনের মধ্যে এমন কী ঘটল যে লালুপ্রসাদ যাদব বিদ্রূপের পাত্র থেকে হয়ে গেলেন প্রায় পুজনীয় ব্যক্তি? না, হিসেবটা ঠিক এতটা সহজ নয়। তাই একটু তলিয়ে দেখা দরকার।

লালুপ্রসাদ রেলমন্ত্রী হিসেবে রেল-কে করে তুলছেন একটা মুনাফা-যোগ্য প্রতিষ্ঠান। তবে সবচেয়ে বড় কথা, ভারতের এই সর্বোচ্চ কর্মসংস্থান তৈরি করা প্রতিষ্ঠানের দরজা খুলে দিচ্ছেন হাট করে। বড় পুঁজিপতিদের জন্য এক বিরাট মুনাফা ধরার সুযোগ করে দিচ্ছেন ধাপে ধাপে রেলের বেসরকারিকরণের মধ্যে দিয়ে। আর শুধু তাই নয়, রেলের হাত ধরে আসছে বিশাল কৃষিপণ্য বিপণন ব্যবসার মুনাফার সুযোগ, এমন আরও কত কী।

লালুপ্রসাদ যতদিন পুঁজিপতিদের তেমন ঘনিষ্ঠ ছিলেন না ততদিন তিনি কৌতুকের পাত্র (হয়তো তা কিছুটা যুক্তিযুক্তও)। আর, এখন লালুবাবু পুঁজির পুজো করছেন তাই তাঁকে 'হিরো' বানানোর তোড়জোড় শুরু হয়েছে। আসলে এমনটাই হয়। আপনি পুঁজির কতটা কাছের মানুষ—বৃহৎ ব্যক্তি-পুঁজির মুনাফা তৈরিতে আপনি কতটা প্রয়োজনীয় তাই আপনার, বিশেষ করে, আপনার কাজের গুরুত্বের মাপকাঠি। আর সেই মাপকাঠিতেই ঠিক হবে আপনার সামাজিক প্রতিষ্ঠাও। সেখানে মানুষের সনাতন প্রতিভা কিংবা মানবিক মূল্যবোধও গুরুত্বহীন।

তাই, সার্কাসে ট্রাপিজের খেলা দেখানো ছেলে-মেয়েদের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হলেও র‍্যাম্পে হাঁটা 'মডেল সুন্দরী'রা শুধু অর্থকরী দিক থেকেই নয় এমন কী সামাজিক প্রতিষ্ঠার নিরিখেও অনেক অনেক এগিয়ে। যে সব ছেলেমেয়ে পেটের দায়ে মানব সভ্যতার প্রাচীনতম শিল্পগুলোর অন্যতম—সার্কাসের সঙ্গে যুক্ত কিংবা যাঁরা সুপ্রাচীন বয়ন শিল্পকে বংশ পরম্পরায় বাঁচিয়ে রেখে জীবিকা নির্বাহ করছেন, তাঁদের খবর 'সুশীল সমাজ' বা রাষ্ট্র তেমন একটা রাখে না। এঁরা আস্তে আস্তে বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছেন। অথচ বিজাতীয় ফ্যাসন ডিজাইনিং বা মডেলিং নিয়ে আদিখ্যেতার শেষ নেই। কারণটা খুব সোজা। শিল্প-টিল্প সব বাজে কথা; আসল কথা হল, মডেলকে বিজ্ঞাপনে ব্যবহার করে পুঁজিপতির ব্যবসা ভালই বাড়ে। অর্থাৎ, মুনাফা তৈরিতে আজকের পণ্য-সংস্কৃতির যুগে মডেলের অতিগুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। তাই মডেলিং-এর এত রমরমা।

একইভাবে বিশুদ্ধ জ্ঞানচর্চার তেমন দাম নেই। আর্টস (ভাষা, সাহিত্য ইত্যাদি) আর সমাজ বিজ্ঞানের বিভিন্ন ধারায় (যেমন দর্শন কিংবা রাষ্ট্র-বিজ্ঞান) গবেষণা,

পঠন-পাঠন ক্রমশ গুরুত্বহীন হয়ে পড়ছে। এমনকী বিজ্ঞানের তাত্ত্বিক ক্ষেত্রেও মন্দা দেখা দিচ্ছে। অথচ, কারিগরি শিক্ষার বিরাট বিশ্বজোড়া বাজার তৈরি হচ্ছে। এখানেও হিসেবটা সহজ। পদার্থবিদ্যা, জীববিদ্যা বা রসায়নের মৌলিক গবেষণা তো আর এক্ষুনি মুনাফা বাড়াতে পারবে না, তাই অল্প কিছু ব্যতিক্রম বাদ দিয়ে বাকি গবেষক-শিক্ষকদের তেমন দাম নেই। কিন্তু সফটওয়্যার কারিগরদের দাম আকাশ ছোঁয়া। এটা ভাবা কি চূড়ান্ত বোকামি নয় যে, সল্টলেক সেক্টর ফাইভেই যত প্রতিভার চাষ হচ্ছে, পশ্চিমবঙ্গের আর কোথাও প্রতিভা বা কর্মদক্ষতা নেই! আসলে সফটওয়্যারের শ্রমিকরা মুনাফা তৈরির প্রক্রিয়ায় পুঁজির অনেক কাছাকাছি থাকায় তাদের এত সামাজিক প্রতিপত্তি।

তাই উদয়াস্ত পরিশ্রম করলেই হবে না, মাথার ঘাম পায়ে ফেলাই যথেষ্ট নয়। মুনাফা তৈরির প্রক্রিয়ায় সরাসরি যুক্ত হতে হবে। তাও আবার যে সে পুঁজি নয়, বিশাল বহুজাতিক পুঁজির নেক নজরে থাকলে তবেই ভাল প্রসাদ মিলবে। সেই পুঁজির জন্য খেটে-খুটে যে যত বেশি উদ্বৃত্ত তৈরি করতে পারবে তার বাজার-দর, সামাজিক প্রতিষ্ঠা সবই ততটাই বেশি।

মডেল শরীর চর্চা করে পণ্যের বাজার প্রশস্ত করবেন। বিজ্ঞানের কারিগর এমন নতুন কিছু আবিষ্কার করবেন যা ব্যবহার করলে মুনাফা বাড়বে (তাতে প্রকৃতি/পরিবেশ দূষিত হলেও ক্ষতি নেই)। কিংবা অর্থনীতিবিদ এমন উন্নয়নের দাওয়াই (তত্ত্ব) দেবেন যা ব্যবহার করে গরিবের সর্বস্ব কেড়ে নিয়ে বহুজাতিক পুঁজি ফুলে ফেঁপে উঠবে। তা হলেই এদের সামাজিক প্রতিষ্ঠা জুটবে। এদের কথা ফলাও করে প্রচার করবে বড় পুঁজিপতিদের ঠিকাদাররা।

তবে শিল্পী-সাহিত্যিকদের ক্ষেত্রে হিসেবটা একটু জটিল। নির্বিঘ্নে মুনাফা তৈরি করতে একটা সামাজিক পরিবেশ লাগে, যেখানে মুনাফা তৈরির প্রক্রিয়ার শাসন-শোষণের দিকটাকে লুকিয়ে রাখতে হয়। তথাকথিত সংস্কৃতির প্রলেপে কষ্টগুলোকে ঢেকে রাখতে হয়। কখনও কখনও বা ব্যক্তি স্বাধীনতার মোড়কে এটা বোঝানোর চেষ্টা করতে হয় যে শোষণ-টোষণ এসব বাজে কথা। আসলে আমরা সবাই সমান জায়গায় দাঁড়িয়ে; আর যে বেশি কর্মদক্ষ কিংবা বুদ্ধিমান সেই জিতবে, এটা তো মেনে নিতেই হবে। এই তথাকথিত শান্তিপূর্ণ বাতাবরণ বজায় রাখতে যারা হাত লাগান বা গলা মেলান এখন তাদের বাজার-দরই বেশি।

অন্যপথে, বিশেষ করে, উল্টোদিকে যারা হাঁটেন, তাদের তেমন কদর নেই। এটা ঠিকই যে গণতন্ত্রের স্বার্থে চলতি পথের সমালোচকদের কিছু জায়গা ছাড়তেই হয়। কারণ, বিরুদ্ধ মতামত তো প্রতি মুহূর্তে তৈরি হচ্ছে। সেই বিরুদ্ধতার কথাও মাঝে মধ্যে শুনতেই হয়, না হলে সামাজিক স্থিরতা নষ্ট হতে পারে। কিন্তু বেশি চেঁচামেচি করলে মোটেই তা সহ্য করা হবে না। প্রথমে বয়কট, তার পর প্রতিআক্রমণ।

আসল সমস্যাটা আরও গভীরে। মুনাফা তৈরির এই মাপকাঠি যদি কেউ ব্যক্তিগত স্তরে ব্যবহার করে, কারও কিছু বলার নেই। অর্থাৎ, আমি মুনাফার মাপকাঠিতে সব উদ্যোগ, দক্ষতা, সৃষ্টিশীলতা বা প্রয়োজনকে মাপি। যা মুনাফা দেবে আমার কাছে তাই একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ। আমার কাছে তারই কদর যার মুনাফা তৈরির ক্ষমতা বেশি। যদি শুধু এটুকুই হত তবে তেমন ঝামেলা ছিল না। ঠিকই আছে, এই নিয়ম তোমার পছন্দ নয়, তুমি পুঁজির দাসত্ব কোর না। সমস্যা মিটে গেল। তোমার পথ আলাদা।

কিন্তু পুঁজি তো সেই শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান সহ্য করে না। আর নিজের মুনাফার যুক্তিতেই সব সামাজিক প্রয়াসকেই দেখতে হবে, এটাই তার দাবি। পুঁজি তার যুক্তিতে কিংবা জোর খাটিয়ে অন্যকে গ্রাস করতে চায়, এটাই পুঁজির চরিত্র। সমাজ, সভ্যতা, প্রকৃতি, পরিবেশ সবই চলবে মুনাফার অঙ্কের নিয়মে এটা মেনে নেওয়া যায় না। কারণ মানুষের অফুরন্ত বৈচিত্র আর শক্তিকে নস্যাৎ করে শুধু পুঁজির যুক্তি। আধিপত্যই শেষ কথা, এটা বলা তো মৌলবাদ—এক ধরনের ধর্মান্ধতা! আর এই ধর্মান্ধতার কারণেই তো পুঁজির নিয়মের বিরোধিতা করলে জোটে উর্দিধারীদের বেদম লাঠিপেটা কিংবা রবার বুলেট।

সাধারণ মানুষের উপকারে না লাগলে কীসের উন্নয়ন

সৌম্য চক্রবর্তী

মাছের তেলে মাছ ভাজা একেই বলে। গ্রাম বাংলার শস্য, বিশেষ করে, ফল-মূল, শাক-সবজি এ সব পশ্চিমবঙ্গের মানুষকেই না খাওয়াতে আসছে রিলায়েন্স গোষ্ঠী। গ্রামীণ এলাকায় 'মান্ডি টাউন' তৈরি করে ওই সব ফসল সংগ্রহ করবে রিলায়েন্স। তার পর 'প্রসেসিং-প্যাকেজিং' করে সে-সব বিক্রি হবে 'রিলায়েন্স ফ্রেশ'-এর বিপণন কেন্দ্রগুলোতে। বড় বড় শপিং মল কিংবা ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে যারা বাজার করে তাদের তাজা ফল কিংবা সবজি পেতে বিশেষ অসুবিধা হবে না। সঙ্গে থাকতে পারে দুধ, দুধ-জাত খাবার, এমনকী মাছ-মাংস ইত্যাদি। মোট কথা, অঞ্চলের সুপার মার্কেটে পাওয়া যাবে নানা রকম টাটকা খাবারদাবার। তার জন্য অযথা দৌড়াদৌড়ি করতে হবে না। আর মফস্বলে তো এ সব অনেক সময় পাওয়াই যায় না। তাই দাম একটু বেশি হলেও ক্ষতি কী? ভাল জিনিস পেতে গেলে তো একটু বেশি মূল্য দিতেই হবে।

উচ্চ মধ্যবিত্ত কিংবা উচ্চবিত্তের পোয়া বারো। রোজ সকালে 'হরিপদ কেরানি'র সঙ্গে ধাক্কা-ধাক্কি করে আর বাজার করতে হবে না। কাদা প্যাচপ্যাচে মাছের বাজারের ঝামেলা নেই, ওজন বা দাম নিয়ে দর কষাকষি নেই। শুধু একটু হয়তো বেশি দাম দিতে হবে, এই যা। যখন তখন তাজা আর রকমারি খাবারটা তো পাওয়া যাবে।

পাঠক ক্ষমা করবেন, কিন্তু এই উজ্জ্বল ছবিটার পেছনে লুকনো ছোটখাট কয়েকটা প্রশ্ন সামনে না এনে থাকা গেল না। সেগুলো ভাল করে আলোচনা না করে রিলায়েন্সকে ব্যবসা করার এই অনুমতি দেওয়া কি ঠিক হল?

প্রথমত, আমরা যারা 'সাদামাঠা', 'ছোটখাট লোক' তাদের কী হবে? টাটকা ফল-সবজি কিংবা মাছ খাওয়ার দিন তা হলে গেল? বলা বাহুল্য, পশ্চিমবঙ্গের মফস্বল আর গ্রামের বেশিরভাগ মানুষই টাটকা ফসলের ব্যাপারে 'লোকাল সাপ্লাই'-এর ওপর নির্ভরশীল। মাছ, ফল, সবজি এমনকী চালটাও যতটুকু যা মেলে তা ওই অঞ্চল থেকেই। এবং অবশ্যই শহরের তুলনায় সস্তায়। এখন 'রিলায়েন্স ফ্রেশ'-এর ঠেলায় পাড়ার ছোট বাজার থেকে সেসব ভ্যানিশ হয়ে যাবে না তো। সমস্যাটা বিশেষ করে মধ্যবিত্ত আর নিম্নবিত্তের। তারা তো আর উচ্চবিত্তের শপিং মল-এ যেতে পারছে না। কেউ ভাবতে পারেন, রিলায়েন্স ব্যবসা শুরু করায় এমন কী আর বড় প্রভাব পড়বে। কিন্তু মনে রাখতে হবে, এটা দু-একটা দোকানের ব্যাপার নয়, রিলায়েন্স হাজার হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ করে ব্যবসায় নামছে।

দ্বিতীয় সমস্যাটা জেলে, গোয়ালা, কিংবা চাষিদের। রিলায়েন্স বলছে, তার ব্যবসায় না কি এদের লাভ হবে। ভাল দামে জিনিস বিক্রির একটা উপায় হবে। কিন্তু সমস্যাটা একটু গভীরে। রিলায়েন্স বিরাট কোম্পানি। কালক্রমে তা-ই হয়ে উঠতে পারে ফল-সবজি-মাছ-মাংস-দুধের বাজারের অন্যতম প্রধান ক্রেতা। অর্থাৎ, চাষিরা এখন যেমন গাঁ-গঞ্জে বা মফস্বলের হাটে এসে নিজেরাই সরাসরি ফসল বিক্রি করতে পারে, অথবা যতটুকুও বা দরাদরি করে ছোট ব্যবসায়ীরা আড়তদারদের কাছে তা বিক্রির সুযোগ পায়, সেই সুযোগটুকুও আর থাকবে না। রিলায়েন্স-এর সঙ্গে যে কোনওরকম দরাদরি চলবে না তা বলাই বাহুল্য। রিলায়েন্স-এর ঠিক করে দেওয়া দামেই হয়তো কালক্রমে ছোট-মাঝারি জেলে, গোয়ালা বা চাষিকে তার ফসলটা বেচে দিতেই হবে। কারণ তার না আছে সংরক্ষণের ব্যবস্থা, না থাকবে সরাসরি বাজারে বিক্রির অধিকার।

প্রশ্ন উঠতে পারে, এত বড় বিরাট রাজ্য, সেখানে রিলায়েন্স যত বড় কোম্পানিই হোক কতটুকুই বা দাঁত ফোটাতে পারবে? সে প্রশ্নের উত্তরও রাজ্য সরকার তৈরি করে ফেলেছে। শুধু আলু নয়, সব ফল-সবজিই 'অন-লাইন'-এ কেনাবেচা শুরু হচ্ছে 'মাল্টি কমোডিটি এক্সচেঞ্জ'-এর মাধ্যমে। ফলে, অকুস্থলে উপস্থিত না থেকেও ফসলের কেনাবেচা দিব্যি করা যাবে। আসলে বিকিকিনি হবে হিমঘর মারফত। রাজ্য জুড়ে ছড়িয়ে থাকা হিমঘরগুলো ফসল সংগ্রহ করবে। এ- কাজে অবশ্যই যুক্ত থাকবে বড় আড়তদাররা। এই ফসলই 'অন লাইন' প্রতিদিন সকাল-বিকেল কিনতে পারবে রিলায়েন্স। তারপর তা অত্যাধুনিক পরিবহনের মাধ্যমে পৌঁছে যাবে 'রিলায়েন্স ফ্রেশ'-এর বিপণন কেন্দ্রগুলোতে। শেষ পর্যন্ত বড় আড়তদার, হিমঘর মালিক আর রিলায়েন্স-এর মতো বিরাট পুঁজিপতির চক্র যে ছোটখাট জেলে, গোয়ালা কিংবা চাষিকে উৎপন্নের সঠিক দাম দেবে না, সেটা বুঝতে খুব একটা কষ্ট হয় না।

আরও একটা সুদূরপ্রসারী বিপদ থাকতে পারে। আমরা জানি, ভারতের নানা জায়গায় আইটিসি, মহিন্দ্রা, পেপসি এসব বড় সংস্থা কৃষিপণ্যের খুচরো ব্যবসায় নামার সঙ্গে সঙ্গেই চাষিদের চুক্তিচাষে যুক্ত করছে। অর্থাৎ, এরা চাষিদের বীজ, সার, কীটনাশক দিচ্ছে, তার সঙ্গে বলে দেওয়া হচ্ছে কী চাষ, কতটা এবং কীভাবে করতে হবে। চুক্তি হল, চাষিরা নিজেদের জমিতে চাষ করে ফসল তুলে দেবে ওই সব কোম্পানির হাতে। রিলায়েন্সও এমনটা করতেই পারে। কিন্তু তাতে চাষিদের স্বাধীন বিকাশের কিংবা ফসল বিপণনের সব সম্ভাবনাই শেষ হবে। প্রাথমিকভাবে মনে হতে পারে এতে চাষিরই লাভ। উপকরণ আর বাজার দুই-ই পাওয়া গেল। কিন্তু একবার বড় পুঁজির হাতে উৎপাদন আর বিপণনের পুরো ব্যাপারটা চলে এলে যে একচেটিয়া শোষণ শুরু হবে না, তার গ্যারান্টি কোথায়।

সবশেষে দেখা উচিত কর্মসংস্থানের দিকটা। খবরে প্রকাশ, রাজ্যে শুধু 'অন লাইন'-এই বিকিকিনি হবে প্রতিদিন দশ হাজার কোটি টাকার কৃষিপণ্য। তা হলেই বোঝা যায়, কী বিশাল পরিমাণ পণ্য আমাদের রাজ্যে কেনাবেচা হয়। এর সঙ্গেই তো যুক্ত অসংখ্য মানুষের কাজ। এরা পণ্য সংরক্ষণ, পরিবহন, বিপণন-এর সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে রয়েছে। আর ঠিক এখানেই রাজ্য সরকারের একটা উদ্যোগ যথেষ্ট কৌতূহল তৈরি করে।

সরকার চাইছে যাতে 'রিলায়েন্স ফ্রেশ'-এর বিপণন কেন্দ্রগুলো যতটা সম্ভব কলকাতার বাইরে খোলা হয়। কিন্তু সেটার ফল তো মারাত্মক। কারণ, কলকাতায় বিপণন যা-ও বা খানিকটা সংগঠিত মফস্বল বা গাঁ-গঞ্জে তা চলে একেবারে ছোট ছোট অসংখ্য ব্যবসায়ী-বিক্রেতার ওপর নির্ভর করে। তারা তো প্রবলভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারেন সরকারি এই সিদ্ধান্তের কারণে।

সরকার বেহালা, বালিগঞ্জ, মানিকতলা কিংবা উল্টোডাঙার ব্যবসায়ীদের বাঁচাতে চাইছে। তার সঙ্গে মফস্বলের উচ্চমধ্যবিত্ত আর উচ্চবিত্তকে টাটকা ফল, সবজি, দুধ খাওয়াতে চাইছে। ভাল কথা, তাতে আপত্তি নেই। কিন্তু তা করতে গিয়ে গ্রামের মফস্বলের লক্ষ লক্ষ কৃষিপণ্যের ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের ক্ষতি হবে না তো। আর এদের সঙ্গেই ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে বিশাল এই অসংগঠিত বিপণনের সঙ্গে নানাভাবে যুক্ত আরও কয়েক লক্ষ মানুষ।

মানুষের ক্ষমতা অসীম। প্রায় কোনওরকম সরকারি সহায়তা ছাড়াই রাজ্যে চলছে হাজার হাজার কোটি টাকার কৃষিজ পণ্য কেনাবেচা। তার সঙ্গে যুক্ত অসংখ্য মানুষের জীবিকা। সরকার এদেরই সংগঠিত করে ফল-মূল, শাক-সবজি, দুধ জোগানোর ব্যবস্থা করতে পারে, তাতে ক্রেতা বিক্রেতা সবার-ই লাভ হত। তবে সেই গুরুদায়িত্ব পালন করতে গেলে সঠিক দিশা লাগে, লাগে আদর্শগতভাবে শক্তিশালী সরকারি, বেসরকারি সংগঠন। এর কোনওটাই সম্ভবত সরকারের হাতে এখন আর নেই। তাই সহজ বাজারি সমাধানই সরকারের একমাত্র ভরসা। লক্ষ লক্ষল সাধারণ উৎপাদক, ক্রেতা, বিক্রেতারই যদি উপকারে না লাগে তবে এ কীসের উন্নয়ন?

লেখক বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতনে অর্থনীতির অধ্যাপক

19th Ant.

গ্রামীণ শিল্প ধ্বংস করেই বিদেশি পণ্য, পরিষেবা আনছে সরকার

সৌম্য চক্রবর্তী

বামফ্রন্টের এতদিনকার শ্রেণি ভিত্তি (ভোট ভিত্তি) হল কৃষির সঙ্গে যুক্ত নানা বর্গের মানুষ। তাই শিল্পকে ভবিষ্যৎ হিসাবে খাড়া করার প্রক্রিয়ায় কৃষিকে একেবারে বাদ দিলে বিপদ। অথচ পশ্চিমবঙ্গের কৃষির অবস্থা শোচনীয়। তাই একদিকে সাবেকি অ-মার্কসীয় উন্নয়ন মডেলের অনুকরণে কৃষির থেকে চোখ ফিরিয়ে পুঁজিবাদী শিল্পায়নের কথা বলা অন্য দিকে কৃষির সঙ্গে যুক্ত মানুষের ভোট ধরে রাখার চেষ্টা। এই দুই-এর সমন্বয় ঘটাতে সিপিআইএম চালিত বামফ্রন্ট সরকার খুব চালাকি করেই "কৃষি ভিত্তি/শিল্প ভবিষ্যত"-এর স্লোগানটা আমদানি করল।

এই স্লোগানের চড়া প্রচারের আড়ালে লুকিয়ে ফেলার চেষ্টা হল কৃষির সমস্যাগুলোকে। এতদিন মূলত কৃষিতে নিযুক্ত নানা শ্রেণির মানুষের ভোটের উপর দাঁড়িয়ে সরকার চালানো সত্ত্বেও কৃষির সত্যিকারের সমস্যাগুলোর পর্যালোচনা বা সমাধানের ব্যাপারে সিপিআইএম-এর চূড়ান্ত দায়সারা ভাব অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। এক্ষেত্রে বামপন্থী রাজনৈতিক দলের কর্তব্য তো দূরের কথা পার্টি দায়িত্বশীল গণতান্ত্রিক সংগঠনের ভূমিকাও বিস্মৃত হয়েছে। বরং সমস্যাগুলোকে ঔদ্ধত্য দিয়ে চেপে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে।

বামপন্থী দল হিসাবে নিজেকে জাহির করলে ভূমি-সংস্কার পরবর্তী যে সব প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে কৃষিকে নিয়ে যেতে হয় তার ধার-পাশ দিয়েও সরকার চলেনি। আসলে, পশ্চিমবঙ্গে ভূমিসংস্কার প্রাথমিকভাবে কিছুটা সাফল্য পেলেও এই প্রক্রিয়া খণ্ডিত খর্বিতই থেকে গিয়েছে। তা সুযোগ বা প্রয়োজনের তুলনায় কম।

প্রথমেই বলে নেওয়া ভাল যে আটের দশকের মাঝামাঝি-ই রাজ্যের ভূমিসংস্কার প্রক্রিয়া প্রায় থেমে এসেছিল। (অন্তত পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মানব উন্নয়ন রিপোর্ট-২০০৪, তাই বলছে)। ২০০০ সালে মোট নথিভুক্ত বর্গাদারের সংখ্যা ছিল ১৬.৮ লক্ষ, যা পশ্চিমবঙ্গের মোট কৃষিজীবী পরিবারের ২০.২ শতাংশ। আর বর্গা রেকর্ড করা জমির পরিমাণ ছিল ১১ (প্রায়) লক্ষ একর, রাজ্যের মোট কৃষিযোগ্য জমির মাত্র ৮.২ শতাংশ। মনে রাখতে হবে, রাজ্যের মোট কৃষিযোগ্য জমির কম বেশি ২০ শতাংশ ভাগ চাষের আওতায়, তাই বর্গা রেকর্ডের উপযুক্ত। অর্থাৎ বর্গা রেকর্ড করা জমির পরিমাণ মোট সুযোগের অর্ধেকেরও কম।

অন্যদিকে, ২০০৪ সাল পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রায় ১১ লক্ষ একর উদ্বৃত্ত জমির পাট্টা ২৭ লক্ষ ৫০ হাজার ভূমিহীন, গরিব ও প্রান্তিক কৃষকের মধ্যে বন্টন করেছে। বণ্টিত জমির অর্ধেকের বেশি (৬ লক্ষ একরের কিছু বেশি) '৭৭-এ বামফ্রন্ট জমানা শুরু হওয়ার আগেই 'বেনামী দখল' হয়েছিল দুর্বার কৃষি আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে। অর্থাৎ বামফ্রন্ট জমানায় ৫ লক্ষ একরের কম জমি বন্টন হয়েছে। অথচ মোট খাস জমির মধ্যে প্রায় ৩ লক্ষ একর বন্টন হয়নি, যখন ভূমিহীন কৃষি শ্রমিকের সংখ্যা বাড়ছে এবং মোট প্রামীণ কর্মী সংখ্যার তা ৩৩ শতাংশ। এই বিপুল সংখ্যায় ভূমিহীন খেতমজুর থাকা সত্ত্বেও কেন যে প্রায় ৩ লক্ষ একর অবন্টিত খাস জমি পড়ে রইল তা সরকারি পার্টিই ভাল বলতে পারবে। উল্টোদিকে, ১৩.২৩ শতাংশ পাট্টাদার জমি হারিয়েছে এবং ১৪.৩৭ শতাংশ বর্গাদার উচ্ছেদ হয়েছে। এর মধ্যে একটা বড় অংশ চাষ ক্রমশই অলাভজনক হয়ে পড়ায় জমি ছাড়তে বাধ্য হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গের গ্রামের অবস্থা যে সার্বিকভাবেই ভাল নয় তা বোঝা যায় আরও কিছু তথ্য থেকে। ২০০০ সালে ভারতের গ্রামীণ মাথাপিছু ব্যয় ছিল মাসে ৪৮৬ টাকা, পশ্চিমবঙ্গে তা ৪৫৪ টাকা। তখনই ভারতের গ্রামে বেকারের অনুপাত ছিল ১.৫ শতাংশ, পশ্চিমবঙ্গের গ্রামে ২.৭ শতাংশ। দারিদ্রের অনুপাত ভারতে ২৭.০৯ শতাংশ, পশ্চিমবঙ্গে ৩১.৮৫ শতাংশ। পশ্চিমবঙ্গের কৃষিশ্রমিকদের ৪৫ শতাংশের বেশি দরিদ্র। গৃহস্থালির বৈদ্যুতিকরণের হিসাবে পশ্চিমবঙ্গের গ্রামের অবস্থান দেশের মধ্যে ১৬ নম্বরে। সেচ ব্যবস্থার দিক দিয়ে নবম, গ্রামীণ সমবায়ের উন্নতির দিক থেকে দশম আর স্বনিযুক্তি প্রকল্প রূপায়ণের মাপকাঠিতে অষ্টম। পশ্চিমবঙ্গর কৃষিঋণের মোট প্রয়োজনের মাত্র ২৯ শতাংশ সরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে আসে। আর ক্ষুদ্রশিল্পে এই অনুপাত মাত্র ৪০ শতাংশ। এসব দেখলে রাজ্য সরকারের কৃষি ভিত্তির গল্পকে মেনে নেওয়া সত্যিই শক্ত। এই কঠিন অবস্থায় ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক আর বর্গাদার জমি বেচে দিতে, চাষের অধিকার ফিরিয়ে দিতে বাধ্য হচ্ছে। ১৯৯১ থেকে ২০০১ এই সময়ে গ্রামীণ কর্মী জনসংখ্যায় চাষির অনুপাত কমেছে ৩৮.৪ শতাংশ থেকে ২৫.৪১

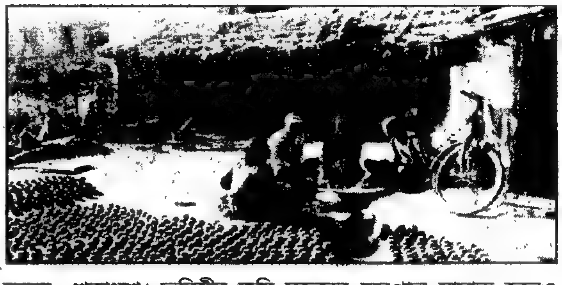

শতাংশে। ভূমিহীন কৃষি মজুরের অনুপাত সামান্য হলেও বেড়েছে, যদিও মোট সংখ্যাটা এমনিতেই বিরাট।

এর ঠিক বিপরীতে অন্য একটা গ্রামীণ পশ্চিমবঙ্গ আছে যার খবর আমরা খুব একটা রাখি না। সেই গ্রাম বাংলা বেঁচে আছে মোটামুটিভাবে ৪০ শতাংশ গ্রামীণ কর্মীকে নিয়ে। এই বিশাল অকৃষি ক্ষেত্রের সবচেয়ে বড় অংশটা হল গ্রামীণ শিল্প। এই শিল্পে ক্ষুদ্র অসংগঠিত কারখানার সংখ্যা ২১ লক্ষের বেশি আর তাতে যুক্ত আছে ৪৪ লক্ষের বেশি মানুষ। এই দুটোর হিসাবেই পশ্চিমবঙ্গ ভারতের মধ্যে প্রথম এবং এখানে নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যার অনুপাত ভারতের গ্রামীণ শিল্পে নিযুক্ত মোট শ্রমিকের ১৮.৪১ শতাংশ। আমরা যখন পশ্চিমবঙ্গের চাষযোগ্য জমির অনুপাত ভারতের মোট চাষযোগ্য জমির মাত্র ৩.৮৮ শতাংশ বলে কান্নাকাটি করছি, তখন এটা কেউ বলছে না যে গ্রামীণ শিল্পে কর্মসংস্থানের হিসাবে রাজ্যের গুরুত্ব পাঁচ ভাগের এক ভাগ। মাথা পিছু জমি কম, কিন্তু মানুষ প্রায় কোন রকম সরকারি সহায়তা ছাড়াই অর্থনীতির নতুন পথ তৈরি করে নিয়েছে গ্রামীণ শিল্পে। এই শিল্পে মূল্যযোগের (Value added) নিরিখে কারখানা প্রতি আয় ভারতের গড়ের থেকে বেশিই, যদিও শ্রমিক পিছু মূল্যযোগ দেশের গড়ের থেকে কম। কারণ সম্ভবত এটাই যে রাজ্যের এই শিল্প সারা দেশের তুলনায় বেশি শ্রম নিবিড়। আর এই গ্রামীণ শিল্পে মোট বার্ষিক আয় প্রায় ১৪ হাজার কোটি টাকা। তার মানে ওই দামের সমান পরিমাণ পণ্য এই শিল্পক্ষেত্র প্রতি বছর বেচে।

সরকারি দলের কিছু নেতা ইদানীং বলছেন যে পশ্চিমবঙ্গের গ্রামে প্রায় ২০ হাজার কোটি টাকার পণ্যের বাজার তৈরি হয়েছে। সেটাকে ব্যবহার করতেই আনা হচ্ছে বড় শিল্প। ওপরের ১৪ হাজার কোটি টাকার গ্রামীণ শিল্প পণ্য বিক্রীর হিসেবটা মাথায় রাখলে সেটা বুঝতে অসুবিধে হয় না। এর সঙ্গে যোগ করতে হবে গ্রামীণ পরিষেবার বাজারটাকেও। সব মিলিয়ে বাজারটা ২০ হাজার কোটি টাকার অনেক বেশিই।

কিন্তু বড় শিল্প পরিষেবা সংস্থা ওই বাজার ধরবে তাই তাদের ডেকে আনা হচ্ছে। সেটা তো মারাত্মক কথা! বলা হচ্ছে বাজার তৈরি হয়েছে, কিন্তু কীভাবে হয়েছে তা উহ্য রাখা হচ্ছে। ওই উহ্যটা পূরণ করলে যা বেরিয়ে আসছে তা ভয়ঙ্কর। যদি অত্যাধুনিক শিল্প পণ্য, পরিষেবা দিয়ে বাজার ভরিয়ে দেওয়া হয় তবে তো গ্রামীণ শিল্প পরিষেবা ধ্বংস করেই তা করতে হবে। ঠিক যেমন ভাবে বাংলার মসলিনকে প্রতিস্থাপিত করেছিল ইংলন্ডের ম্যানচেস্টারের মিলের কাপড়। ঠিক যে ভাবে ব্রিটিশ যুগে বাংলায় বি-শিল্পায়ন ঘটেছিল। অত্যাধুনিক দেশি-বিদেশি কোম্পানির পণ্য গ্রামীণ বাজারে ঢুকে পড়লে যে বিপুল সংখ্যায় মানুষের সমূহ বিপদ হবে সে ইঙ্গিত এমন কী পশ্চিমবঙ্গ মানব উন্নয়ন রিপোর্টেও খুব পরিষ্কার।

সরকার বিশেষজ্ঞদের মতামতের তোয়াক্কা না করেই গ্রামের বাজার শিল্পকে পাইয়ে দিতে রিলায়েন্স, আদানি, মেট্রো এরকম কত কত সংস্থাকে নিয়ে আসছে। অথচ গ্রামীণ শিল্পের জন্য সামান্য ঋণের ব্যবস্থাও না কি ঠিক মতো করা যাচ্ছে না।

লেখক বিশ্বভারতীর অর্থনীতির অধ্যাপক

উন্নয়ন যেখানে পুঁজি-নিবিড়, কাজ পায় খুব কম লোকই

সৌম্য চক্রবর্তী

দেশজুড়ে অবিশ্রাম ঢাক-ঢোল পিটিয়ে চলছে আর্থিক সংস্কারের রথ। প্রথমে ১৯৮৪-৮৫ সালে এবং তার পর ১৯৯১-তে ভারতের অনেকটাই নতুন পথে চলা শুরু। সে-সময় সর্বরোগহরা হিসেবে হাজির করা হয়েছিল উদারনীতির পথকে। বিশেষ করে, যুক্তিটা ছিল এমনই যে ভারতে প্রচুর উদ্বৃত্ত শ্রমিক আছে। সেই ক্ষমতাকে কাজে লাগাতে গেলে দরকার পুঁজি। পুঁজি-কেন্দ্রিক শিল্পায়ন হলে শুধু শহরেই নয় গ্রামেও কর্মসংস্থানের জোয়ার আসবে। অত্যাধুনিক শিল্প কিংবা পরিষেবার বাইরেও কৃষিকে সরকারি ঘেরাটোপ থেকে মুক্ত করতে পারলে সেখানেও ব্যাপক বিনিয়োগ হবে, হবে প্রচুর কর্মসংস্থান। তার সঙ্গে দারিদ্র-অসাম্যও মিটবে। দেখা যাক, অন্তত কর্মসংস্থানের হিসেবে গত ১৫ বছরের বিনিয়োগে ভেসে আমরা কী পেলাম।

***

এক এক করে দেখা যাক গ্রাম-শহর-পুরুষ-মহিলা এবং সবশেষে সবাই মিলে কে কী পেলেন। প্রথমেই যদি শহরের পুরুষের কথা বলি তবে দেখব প্রতি ১০০০ পুরুষের মধ্যে কর্মরতর সংখ্যাটা গত ৩২ বছরে (১৯৭৩-২০০৫) বেশ বেড়েছে (প্রতি হাজারে ৫০১ থেকে বেড়ে হয়েছে ৫৪৯)। এটা বেশ বড় একটা বৃদ্ধি। শহরের মহিলাদের ক্ষেত্রেও অবস্থাটা অনেকটাই ভাল হয়েছে, যদিও ১৯৯৩-৯৪ (উদারনীতি গ্রহণের পর পর) সালকে ভিত্তি ধরলে এই বাড়াটা তেমন কিছু নয় (১৫৫ থেকে ১৬৬); ১৯৭৭-৭৮-এর সাপেক্ষে এই বাড়াটা আরও কম। এর মধ্যেও যেটা চোখে লাগে তা হল শহরে কর্মরত পুরুষ ও মহিলার সংখ্যার (অনুপাত) মধ্যে কী কুৎসিত ফারাক। আর এই ফারাকটা কিন্তু উদারীকরণের পর থেকে বাড়ছে! সবশেষে যদি শহরের সর্বমোট কর্মসংস্থানের বৃদ্ধি দেখি তবে সেটা মোটেই আহামরি কিছু নয়। এটা বিশেষ করে ১৯৯৩-৯৪-এর সাপেক্ষে দেখলে চোখে লাগে। যেটা সত্যিই ভাবনার তা হল, শহরে সর্বশেষ কর্মসংস্থানের অবস্থা। এত ঢক্কানিনাদের পর প্রতি হাজারে মাত্র ৩৬৫ জন! তবু যদি ধরেও নিই যে ইন্ডিয়া শহরের পুরুষের হাত ধরে — শাইনিং, গ্রামের দিকে চোখ ফেরালে উদারীকরণের প্রবক্তাদের পণ্ডশ্রমের অনুভূতিই হওয়া উচিত।

গ্রামের পুরুষদের প্রতি হাজারে সবরকমের কাজে যুক্ত এমন লোকের সংখ্যা বাড়ে তো নিই, বরং ১৯৭৭-৭৮ কিংবা ১৯৯৩-৯৪-এর তুলনায় খানিকটা কমেইছে। অন্যদিকে, গ্রামীণ মহিলাদের অবস্থা ১৯৭২-৭৩-এর তুলনায় ভাল হলেও ১৯৮৩-র তুলনায় ২০০৪-০৫-এ বেশ খারাপ হয়েছে। তবে একটা কথা বলা উচিত মহিলাদের মধ্যে গ্রামের মহিলাদের অবস্থা শহরের তুলনায় অনেক ভাল। এটা আধুনিক শিল্প-পরিষেবা ভিত্তিক শহরের তথাকথিত উন্নয়ন-এর সম্ভবত সবচেয়ে বড় বিফলতা। এই 'উন্নয়ন' কিছু অংশের মানুষের জন্য স্বাচ্ছন্দ্য আনলেও নারী-পুরুষের কাজের সমানাধিকারের প্রশ্নে চূড়ান্ত ব্যর্থ। গ্রামের সব মিলিয়ে মোট কর্মসংস্থানের দিকে তাকালে দেখা যাবে ১৯৮৩ কিংবা ১৯৯৩-এর তুলনায় এখন অবস্থা খারাপই হয়েছে।

প্রতি ১০০০ জনে কর্মরতর সংখ্যা সাধারণ নিয়োগ অনুসারে									
সূত্র : জাতীয় নমুনা সমীক্ষা ৬১তম সার্ভে রাউন্ড; রিপোর্ট নং : ৫১৫ পৃষ্ঠা : ৭৬									
	গ্রাম	গ্রাম	গ্রাম	শহর	শহর	শহর	মোট	মোট	মোট
সাল	পুরুষ	মহিলা	সর্বমোট	পুরুষ	মহিলা	সর্বমোট	পুরুষ	মহিলা	সর্বমোট
২০০৪-০৫	৫৪৬	৩২৭	৪৩৯	৫৪৯	১৬৬	৩৬৫	৫৪৭	২৮৭	৪২০
১৯৯৯-২০০০	৫৩১	২৯৯	৪১৭	৫১৮	১৩৯	৩৩৭	৫২৭	২৫৯	৩৯৭
১৯৯৩-৯৪	৫৫৩	৩২৮	৪৪৪	৫২১	১৫৫	৩৪৭	৫৪৫	২৮৬	৪২০
১৯৮৭-৮৮	৫৩৯	৩২৩	৪৩৪	৫০৬	১৫২	৩৩৭	৫৩১	২৮৫	৪১২
১৯৮৩	৫৪৭	৩৪০	৪৪৫	৫১২	১৫১	৩৪০	৫৩৮	২১৬	৪২০
১৯৭৭-৭৮	৫৫২	৩৩১	৪৪৪	৫০৮	১৫৬	৩৪১	৫৪৩	২৯৭	৪২৩
১৯৭২-৭৩	৫৪৫	৩১৮	—	৫০১	১৩৪	—	—	—	—

অন্যদিকে, গ্রাম-শহর মেলালে পুরুষের কর্মসংস্থানের হার প্রায় একই থেকে গেছে। আর মহিলাদের অবস্থা খারাপ হয়েছে। তাই সব মিলিয়ে নারী-পুরুষ কর্মসংস্থানের অসাম্য বেড়েছে। শেষে যদি সার্বিক ছবিটা দেখি, প্রতি ১০০০ জনসংখ্যায় কর্মরত মানুষের অনুপাত এ-মুহূর্তে ১৯৮৩ ও ১৯৯৩-এর সঙ্গে একেবারে একই জায়গায় আছে। তা হলে কীসের উন্নয়ন হল এতদিন; দীর্ঘ দু'দশক? কোথায় পৌঁছলাম আমরা? হ্যাঁ, দারিদ্র হয়তো কিছুটা কমেছে। উচ্চবিত্ত, উচ্চমধ্যবিত্তর আয় বেড়েছে বহুগুণ। কিন্তু অসাম্য বেড়েছে সর্বত্র, সব ধরনের অসাম্য। সব দেখে শুনে সুকুমার রায়ের সেই কবিতাটার কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। সেই আমড়াতলার মোড় খুঁজে পাওয়ার গল্পটা। অনেক ডাইনে-বাঁয়ে সোজা ঘুরে ঘুরে শেষ পর্যন্ত আমড়াতলার মোড় থেকে শুরু করে আবার সেই আমড়াতলার মোড়েই ফিরে আসা! আর সবচেয়ে মনে পড়ছে শেষ লাইনটা : "তার পরে যাও যেথায় চলে/ জ্বালিও নাকো মোরে"। আমাদের সরকারের উত্তরটাও যেন অনেকটাই সেরকম। সরকার বলছে, উন্নয়ন চাই তা-ই উচ্ছেদ তো হবেই; খামোকা এই নিয়ে গণ্ডগোল পাকানো কেন? আর এর সপক্ষে যুক্তি শানাচ্ছে রঙ-বেরঙের বুদ্ধিজীবীরা।

যুক্তি হিসেবে জনসংখ্যার বৃদ্ধিকে অনেক সময়েই কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হয়। কিংবা এটাও বলা যেতে পারে যে, দেশজুড়ে নগরায়ণ হচ্ছে, তাই শহরে জনসংখ্যার চাপ ক্রমাগত বাড়ছে। এসব মিলিয়ে শহরের শিল্প-পরিষেবা

ক্ষেত্রের ওপর নতুন কর্মসংস্থান তৈরির চাপ ঊর্ধ্বমুখী। এর মধ্যেও যে শহরের অবস্থা কর্মসংস্থানের মাপকাঠিতে কিছুটা ভাল হয়েছে, এটাই অনেক। এগুলো আসলে অক্ষমের যুক্তি। এই সব সমস্যা মেটানো যাবে বলেই তো দু'দশক ধরে উদারনীতির অন্ধ ভক্তরা বলে এলেন নতুন পথে হাঁটতে হবে; সরকার-নির্ভরতা কমাতে হবে। শহর নিয়ে বেশি মাতামাতি চলছে ঠিকই, কিন্তু মনে রাখতে হবে এখনও ভারতে প্রায় ৭৫ শতাংশ মানুষ গ্রামেই বাস করে। সংখ্যার বিচারে, ২০০১ আদমসুমারি অনুসারে ভারতের মোট জনসংখ্যার (১০২ কোটি ৭০ লক্ষ) মধ্যে ৭৪ কোটি ১৬ লক্ষ মানুষ গ্রামে বসবাস করে। আর শহর নিয়েও বড়াই করার মতো কিছুই অর্জন করা যায়নি। আগের অবস্থা বজায় রাখার জন্যই উদারীকরণের নামে এত, উচ্ছেদ, এত অসাম্য, এত ক্ষতিস্বীকার! এইসব হিসেব কিন্তু মোট কর্মরত মানুষের সংখ্যার খতিয়ান। মনে রাখতে হবে, এর মধ্যে স্থায়ী চাকরির কিংবা স্বনিযুক্তির সুযোগের অনুপাত ক্রমশ কমেছে। আর বাড়ছে অনিয়মিত কাজের শতাংশ-অসংগঠিত ক্ষেত্রের বহর। অথচ সরকার অসংগঠিত ক্ষেত্রের জন্য কিছু 'ইনস্যুরেন্স' কিংবা নামমাত্র পেনশন প্রকল্প দিয়েই সমস্যার মোকাবিলা করার চেষ্টা করছে।

একটা প্রশ্ন উঠবে, জাতীয় আয়ের বৃদ্ধির হার ঊর্ধ্বগতি, তবু কেন কর্মসংস্থান সব মিলিয়ে তেমন একটা বাড়ছে না। এর উত্তরও তথ্যের মধ্যেই রয়েছে। ১৯৮৩ থেকে ১৯৯৩-৯৪ এই সময়ে জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধির বার্ষিক হার ছিল ৫.২ শতাংশ। আর ১৯৯৩-৯৪ থেকে ১৯৯৯-২০০০ এই সময় তা বেড়ে দাঁড়ায় ৬.৭ শতাংশ। অথচ কর্মসংস্থান বৃদ্ধির হার প্রথম পর্যায়ে ২.৭ শতাংশ থাকলেও পরবর্তী পর্যায়ে তা কমে দাঁড়ায় মাত্র ১.১ শতাংশে। অর্থাৎ, ১৯৮৩-৯৩ দশকের তুলনায় ১৯৯৪-২০০০ এই সময়ে জাতীয় আয় বৃদ্ধির হার বেড়েছে, অথচ কর্মসংস্থান বৃদ্ধির হার হয়ে গেছে অর্ধেকেরও কম। এই ছবিটাই অন্যভাবে দেখা যায় কর্মসংস্থান স্থিতিস্থাপকতার পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে। ১৯৮৩-৯৩ দশকে যেখানে ১ শতাংশ জাতীয় আয় বাড়লে চাকরির হার বাড়ত ০.৫ শতাংশ, ১৯৯৪-২০০০এ তা কমে দাঁড়ায় মাত্র ০.২ শতাংশে। অর্থাৎ, ১০ শতাংশ জাতীয় আয় বাড়লে মাত্র ২ শতাংশ কর্মসংস্থান বৃদ্ধি হবে। অর্থনীতিবিদ এবং পরিকল্পনা রূপায়ণকারীরাই হিসেব করে দেখেছেন যে, জাতীয় উৎপাদন/ আয় বাড়ার হার ৮ শতাংশ হলে বছরে বড় জোর ৫০-৬০ লাখ নতুন চাকরির সুযোগ তৈরি হয়। এভাবে চললেও অদূর ভবিষ্যতে জমে থাকা বেকারত্ব অল্পই ঘুচবে। উপরন্তু হাজার হাজার নতুন বেকার তৈরি হবে। এই নতুন শিক্ষিত যুবক-যুবতীরা কোথায় যাবে, এর উত্তর ভারতের শিল্পায়নের কারিগররা দিতে পারছেন না। এটা হচ্ছে কেন? এক কথায় বললে, বিশেষ ধরনের পুঁজি-নিবিড় শিল্পায়ন যেখানে, কর্মসংস্থান তৈরি হয় খুব সামান্যই।

লেখক বিশ্বভারতীর অর্থনীতির অধ্যাপক

১৫ বর্ষ ১৭৪ সংখ্যা। সম্পাদক : সৃঞ্জয় বোস। কলকাতা, শিলিগুড়ি ও বড়জোড়া থেকে প্রকাশিত। কলকাতা : প্রতিদিন প্রকাশনী লিমিটেডের পক্ষে সৃঞ্জয় বোস কর্তৃক বি এল পাব্লিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ২০ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭২ থেকে মুদ্রিত এবং প্রকাশিত
বড়জোড়া : প্রতিদিন প্রকাশনী লিমিটেডের পক্ষে সৃঞ্জয় বোস কর্তৃক প্রত্যহ নিউজ সার্ভিস প্রাইভেট লিমিটেড, ভিলেজ : ঘুটগড়িয়া, পোঃ অঃ : বড়জোড়া, মৌজা : কাদাশোল, জেলা : বাঁকুড়া থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ফোন : (০৩২৪১) ২৫৭৩০
শিলিগুড়ি : প্রতিদিন প্রকাশনী লিমিটেডের পক্ষে সৃঞ্জয় বোস কর্তৃক দর্পণ পাব্লিকেশনস প্রাঃ লিঃ, ৩ মাইল, সেবক রোড, শিলিগুড়ি ৭৩৪০০৮ থেকে মুদ্রিত ও সিটি প্লাজা কমপ্লেক্স, ৩য় তল, সেবক রোড, শিলিগুড়ি ৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত। ফোন : (০৩৫৩) ২৫৪২২০
Regd. No. WBBEN 53080/92, Post Regd. No. WB/CC 635
email : pratidin @cal2.vsnl.net.in Regd. No. WBBEN 53080/92, Post Regd. No. WB/CC 635
Volume No 15 Issue No 174 Editor : Srinjoy Bose. Printed & Published Simultaneously from Kolkata, Siliguri & Barjora. Kolkata : Printed & Published by Srinjoy Bose on behalf of Pratidin Prakashani Ltd. 20, Prafulla Sarkar Street, Kolkata - 700 072, from Kolkata - 700 072, Phone : 2212-8400-5. Fax No. : 2212-6036\31 From : Siliguri : Printed by Srinjoy Bose on behalf of Pratidin Prakashani Ltd. at Darpan Publications Pvt. Ltd, 3rd mile, Sevak Road, Siliguri-734008 & Published by him from City Plaza From : Barjora : Printed & Published by Srinjoy Bose on behalf of Pratidin Prakashani Ltd. at Pratyaha News Service Pvt. Ltd., Vill. : Ghutgaria, P.O. : Barjora, Mouza : Kadashole, Dist. : Bankura. Tel : (03241) 25
e.mail pratidin @cal2.vsnl.net.in Regd. No. WBBEN 53080/92, Post Regd. No. WB/CC 635

কৃষি থেকে শিল্পে উত্তরণের ৫০ বছরের পুরনো ভুল তত্ত্বই প্রচার করা হচ্ছে

সৌম্য চক্রবর্তী

পশ্চিমবঙ্গ সরকার সবাইকে একটা অঙ্ক শেখাতে উঠে-পড়ে লেগেছে! ছোটবেলার নামতা শেখার মতোই পড়ানো হচ্ছে : "পুঁজিবাদ= শিল্পায়ন= উন্নয়ন"। আর যারা এই সমীকরণটা নিয়ে প্রশ্ন তুলছে তাদের ছাপ মেরে দেওয়া হচ্ছে উন্নয়ন বিরোধী হিসেবে! রীতিমত বিজ্ঞাপন দিয়ে প্রচার করা হচ্ছে এই উন্নয়ন মডেলের কথা। বলা হচ্ছে, এই পুঁজিবাদী শিল্পায়ন নাকি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রচুর কর্মসংস্থান তৈরি করবে। ফলে, কৃষি ক্ষেত্রের উদ্বৃত্ত/বেকার শ্রম-শক্তির বিকল্প কাজের সুযোগ হবে। শিল্প হলে, সেখানে শুধু শহরের ছেলেমেয়েরাই নয়, গ্রামের বেকার যুবক-যুবতীও নাকি প্রচুর কাজ পাবে। সব মিলিয়ে আয় বাড়বে—হবে "উন্নয়ন"।

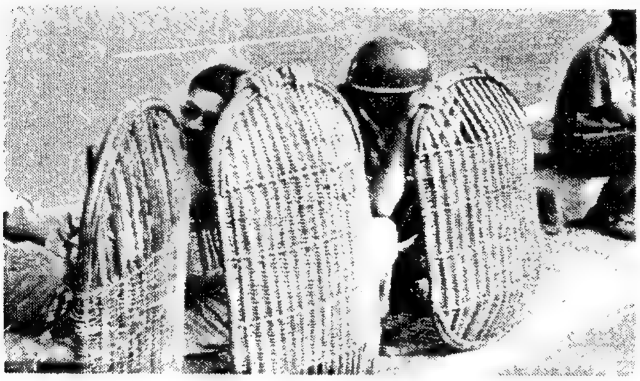

প্রথমেই বলে রাখা উচিত কৃষি থেকে শিল্পে "উত্তরণ"-এর এই তত্ত্ব অর্ধ-শতাব্দী প্রাচীন। আর সবচেয়ে চিন্তার বিষয় হল পৃথিবীর অনেক দেশের অভিজ্ঞতাই কিন্তু এই "মডেল"কে ভুল প্রমাণিত করেছে। আধুনিক শহরভিত্তিক শিল্পায়নের ফসল সমাজের উঁচু-তলা থেকে চুঁইয়ে পড়ার ধারণাটা কার্যকর করা যায়নি। ভাবা হয়েছিল, আধুনিক শিল্পায়নের ফলে প্রাথমিকভাবে উচ্চ-শিক্ষিত/দক্ষ মানুষের কর্মসংস্থান ও আয় বাড়লেও আস্তে আস্তে তার প্রভাব সমাজের সব স্তরেই ছড়িয়ে পড়বে। প্রাথমিক শিল্পায়নের ধাক্কায় পুঁজিপতির মুনাফা যেমন বাড়বে, তেমনই উচ্চ-শিক্ষিতের কর্মসংস্থান ও আয়ও তৈরি হবে। পরবর্তী ধাপে, একদিকে পুঁজিপতি তার বর্ধিত মুনাফা বিনিয়োগ করে নতুন শিল্প তৈরি করবে, অন্য দিকে উচ্চ-শিক্ষিতের আয় বাড়ায় নতুন নতুন শিল্পের চাহিদা তৈরি হবে। সব মিলিয়ে এভাবেই শিল্পায়ন প্রক্রিয়াটা নাকি চলতেই থাকবে। ফলে আরও আরও কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে। সমাজের সব স্তরের মানুষের কাছেই তার সুফল পৌঁছবে। সমস্যা হল, এই পুঁজিবাদী শিল্পায়নের ফল ভোগ করেছে মূলত সমাজের ওপর তলা। গ্রাম থেকে কাজের সন্ধানে শহরে আসা মানুষ অসংগঠিত ক্ষেত্রের আয়তন বাড়িয়েছে। বিশ্ব-ব্যাঙ্ক কিংবা বিভিন্ন সরকারি হিসেবে দারিদ্র কিছুটা কমলেও অসাম্য বেড়েছে বহুগুণ। এ সব এমনকী অর্থনীতির স্নাতক স্তরের ছাত্রের কাছেও খুব স্পষ্ট। অথচ রাজ্য সরকার সেই পুরনো উন্নয়ন মডেলটাই আমদানি করার কথা বলতে শুরু করল।

আধুনিক শিল্প হলে ব্যাপক কর্মসংস্থান হবে, এই দাবিটাকে একটু তলিয়ে দেখা উচিত। আধুনিক শিল্পে কাজের সুযোগ কম, কারণ তা পুঁজি নিবিড়। কর্মসংস্থান যা তৈরি হবে তার বেশিরভাগটাই বাইরের অসংগঠিত ক্ষেত্রে। অর্থাৎ, কারখানার ভেতরে কাজ জুটবে শুধুমাত্র উচ্চশিক্ষিতদের; আর অসংখ্য তথাকথিত সাধারণ যুবক-যুবতীর জন্য পড়ে থাকবে অসংগঠিত অনুসারী শিল্প-ক্ষেত্র। সেখানে না আছে বলার মতো আয় না কাজের নিশ্চয়তা। এশিয়া, আফ্রিকা বিশেষ করে লাতিন আমেরিকার বিভিন্ন উন্নয়নশীল দেশের অভিজ্ঞতাও অনেকটা সেরকম। এমনকী আমাদের অন্যান্য রাজ্যেও (যেমন তামিলনাড়ু, মহারাষ্ট্র, গুজরাত ইত্যাদি) ছবিটা অন্য কিছু নয়। সর্বত্রই ঠিকা শ্রমিকের অনুপাত দ্রুত বাড়ছে। স্বল্পমেয়াদি চুক্তিতে মূল কারখানার বাইরেই অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের দিয়ে উপকরণ তৈরির কাজটা করিয়ে নেওয়া হচ্ছে। এর অনেক সুবিধা। দীর্ঘকালীন চুক্তির দায়দায়িত্ব নেই; আর কাজ করিয়ে নেওয়া যায় অত্যন্ত কম মজুরিতে।

এই প্রক্রিয়ায় সব মিলিয়ে আয় বাড়বে খুবই কম, কারণ কর্মসংস্থানের মূল উৎস তো অসংগঠিত ক্ষেত্র, আর সেখানে প্রাপ্তি সামান্যই। ফলে, প্রথম ধাক্কার শিল্পায়নের প্রভাবে সার্বিক আয় বেড়ে আরও আরও নতুন শিল্পের চাহিদা তৈরি হবে সে-সুযোগ প্রায় নেই বললেই চলে। আধুনিক শিল্প হলে পুঁজিপতির মুনাফা হবে সন্দেহ নেই। কিন্তু তা বহু মানুষের আয় বাড়িয়ে সাধারণের কাজে লাগে এমন শ্রমনিবিড় শিল্প-পণ্যের ব্যাপক চাহিদা তৈরি করবে, আর সেই চাহিদার ওপর ভিত্তি করে নতুন নতুন শিল্প হবে, এটা দুরাশাই!

অন্য দিকে, এই সব অত্যাধুনিক শিল্পে উৎপাদনশীলতা বেশি হওয়ায় প্রচুর মুনাফা হয়। অথচ, সেই মুনাফা আবার রাজ্যেই বিনিয়োগ হয়ে নতুন শিল্প, নতুন কর্মসংস্থান তৈরি করবে তার গ্যারান্টি কোথায়? তাই, আধুনিক পুঁজিনিবিড় শিল্প প্রচুর উৎপাদন, বিরাট মুনাফা করলেও তা যে নিরবচ্ছিন্ন অর্থনৈতিক বৃদ্ধি আনবে তার নিশ্চয়তা নেই। এই মুনাফার একটা বিরাট অংশ তো চলে যায় ফাটকা বাজারে। সে-কারণেই (রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হিসেবে) বড় কোম্পানিগুলির আয়ের প্রায় ৩৫ শতাংশ আসে বিক্রি বহির্ভূত অন্যান্য খাত থেকে। অদ্ভুতভাবে, বিক্রি না বাড়লেও এদের মুনাফা ঠিকই বাড়ে। আর সেই বাড়তি মুনাফাটা আসে ফাটকা থেকেই। আসলে মুনাফা তৈরিটাই শেষ কথা; তার জন্য ক্রমাগত নতুন শিল্পে বিনিয়োগ করে যেতে হবে এমন কোনও বাধ্যবাধকতা নেই। মুনাফা যদি ফাটকা খেলে আসে, তবে পুঁজিপতি সেখানেই টাকা ঢালবে, নতুন শিল্পে নয়। আর, উদ্বৃত্ত পুঁজি যদি সব সময় বিনিয়োগই হবে তা হলে আমাদের ব্যাঙ্কগুলি পাহাড় প্রমাণ পুঁজি নিয়ে বসে আছে কেন? কেনই বা সুদ কমিয়েও বিনিয়োগ বাড়াতে না পেরে শেষ পর্যন্ত বাড়ির লোন-গাড়ির লোন নেওয়ানোর জন্য ব্যাঙ্কগুলি আমাদের পেছন-পেছন ধাওয়া করছে? আসলে, পুঁজি খুঁজে বেড়ায় আরও আরও মুনাফার উৎস। যেখানে মুনাফার হার বেশি, পুঁজি বিনিয়োগ হবে সেখানেই। কোনও বিশেষ রাজ্যে কিংবা সাধারণ মানুষের কাজে লাগে এমন শ্রম-নিবিড় পণ্য উৎপাদনেই তার বিনিয়োগ হবে এমন 'মাথার দিব্যি' কেউ দেয়নি। সেই দায়বদ্ধতা পুঁজির নিয়মবিরুদ্ধ। বিনিয়োগকে বিস্তৃত করে সাধারণের সস্তা ভোগ্য-পণ্য তৈরি করা, সর্বোপরি, আরও আরও কর্মসংস্থান তৈরি করাই পুঁজির কর্তব্য, এটা যাঁরা বলছেন, তাঁরা মূর্খের স্বর্গে বাস করছেন। তাঁরা সম্ভবত পুঁজির যুক্তিটাই বোঝেন না। সাধারণের ভোগ্য-পণ্য কিংবা কর্মসংস্থানের জন্য ভরসা সেই অল্প আয়ের অসংগঠিত ক্ষেত্র। সেখানে আধুনিক শিল্পের 'গ্ল্যামার' চুঁইয়ে নামে না!

লেখক : বিশ্বভারতীর অর্থনীতির অধ্যাপক

-এর চিঠি

আধুনিক শিল্পে উৎপাদন প্রচুর, তত কাজ কিন্তু নেই

সৌম্য চক্রবর্তী

সরকার আর বিরোধীপক্ষ দু'য়ের কাছেই এখন 'সিঙ্গুর' মানে অনেক কিছু। বিরোধীরা বলছে, সিঙ্গুর হল প্রতিবাদ-প্রতিরোধের প্রতীক। অন্যদিকে, টাটা কোম্পানির ছোট মোটর গাড়ি তৈরির এই প্রকল্পকে পশ্চিমবঙ্গের শিল্পায়ন প্রক্রিয়ার 'ব্র্যান্ড নেম' হিসাবে হাজির করার চেষ্টা করছে রাজ্য সরকার। সিঙ্গুরে টাটার কারখানা হলে বাঙালির নাকি সম্মান বাড়বে; বাঙালির উপর ভরসা রাখা যায়, এই ধারণাটাই নাকি চারপাশে ছড়িয়ে পড়বে। ফলে, পুঁজি আসবে, আরও আরও শিল্প হবে রাজ্যজুড়ে। এতে লাভ হবে দু'রকম। একদিকে যেমন কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে, অন্যদিকে, ক্রেতা-সাধারণের হাতের কাছেই চলে আসবে রং-বেরঙের ভোগ্যপণ্য।

সিঙ্গুরে টাটার কারখানার সপক্ষে এই দুটো যুক্তিই রীতিমতো বিজ্ঞাপন দিয়ে প্রচার করা হচ্ছে—এক, সিঙ্গুরের চেহারাটাই নাকি বদলে যাবে—এলাকার মানুষের সার্বিক জীবনযাত্রার মান অনেক ভাল হবে; দুই, ছোট মোটরগাড়ির কারখানা হলে মধ্যবিত্তের স্বপ্ন পূরণ হবে, হাত বাড়ালেই পাওয়া যাবে আস্ত একটা গাড়ি! এটা বেশ লোভনীয় প্রস্তাব। ফলে, শুধু সিঙ্গুরবাসীরই লাভ নয়, সারা রাজ্যের মধ্যবিত্তেরও পোয়া বারো।—একটা ঝকঝকে মোটরগাড়ি! অবশ্য সরকার গাড়ির স্বপ্নের ফেরিওয়ালার ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেও, সেটা যে তেলে চলবে তার উপর ট্যাক্স (সারচার্জ) কমাতে নারাজ। গাড়ি তো হবে, কিন্তু তেলের দাম যে ক্রমাগত বেড়েই চলেছে; গাড়িটা চলবে কীসে? আর সবচেয়ে বড় কথা, গাড়ি চড়তে গেলে সেটাকে এখানেই তৈরি করতে হবে, এটা কি হাস্যকর যুক্তি নয়? তা হলে তো যা-যা আমরা ব্যবহার করি সব কিছুই রাজ্যের মধ্যেই বানাতে হয়। বিশ্বায়নের যুগে এই যুক্তি তো একেবারেই খেলো।

বরং, সিঙ্গুরে কারখানা করলে টাটার লাভ অনেক। বড়-মসৃণ রাস্তা আছে, প্রচুর জল আর বিদ্যুৎ আছে। হাতের কাছেই রয়েছে রেল আর পোর্ট। জামশেদপুর থেকে আনা যাবে স্টিল ও অন্যান্য পার্টস। পাওয়া যাবে কোলকাতার দক্ষ অথচ তুলনামূলকভাবে সস্তা শ্রমিক, ইঞ্জিনিয়র ইত্যাদি। অর্থাৎ কম খরচে কাঁচামাল আর দক্ষ শ্রমিক পেতে কোনও অসুবিধাই হবে না। আবার কোলকাতা তথা সমস্ত পূর্ব ভারতেই বাজার ধরা যাবে। অনেক কম খরচে শো-রুমে পৌঁছে যাবে মোটরগাড়ি। সিঙ্গুরে কারখানা হলে টাটার এত কিছু সুবিধে! কিন্তু এর মানেই যে আমরা তুলনামূলকভাবে কম দামে মোটরগাড়ি কিনতে পারব তার কোনও গ্যারান্টি নেই। আর সেটা যদি হত তবে তো আমরা মারুতির গাড়ি কিনতে দিল্লি ছুটতাম, কিংবা বিমলের কাপড় কিনতে রিলায়েন্স-এর কারখানায় অথবা আমূল-মাখন কিনতে গুজরাত। বাজার থাকলে পণ্য সেখানে আসবেই। বাজারকে দৌড়তে হবে না পণ্যের খোঁজে।

এই বাজার এখন দেশের এমনকী পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে। পুঁজিপতি যেখানেই ভাল দাম পাবে সেখানেই পণ্য বেচবে। আর বিশ্বায়িত বাজারে যা খুশি দাম হাঁকাও অসুবিধাজনক। সব সময় রয়েছে প্রতিযোগিতার ভয়। একজন বেশি দাম হাঁকলে অন্য কেউ বাজার দখল করে নেবে কম দামের লোভ দেখিয়ে। মুক্ত বাজার মানেই [illegible] ভোক্তার (কনজিউমার-এর) পৌষ মাস। সারা পৃথিবীর পণ্যসম্ভার তার হাতের মুঠোয়; অবশ্য যদি টাকা থাকে। 'টাকাটাই শেষ কথা'। আর টাকা থাকলে পণ্য এমনিই আসবে, তার জন্য পুঁজিপতির হাতে-পায়ে ধরতে হবে কেন! সেই পণ্য হলদিয়া কিংবা হনলুলু কোথায় তৈরি হল, তা অবান্তর। গাড়ির বাজার থাকলে গাড়ি দৌড়ে আসবে (উড়েও আসতে পারে)। পুঁজিপতি পণ্য আনবে মুনাফার লোভে। মধ্যবিত্তকে অশালীনভাবে লোভ দেখিয়ে পুঁজিপতিদের পক্ষে দাঁড় করানোর প্রয়োজন হবে না। সিঙ্গুরে কারখানা হলে ক্রেতার সুবিধে, এটা বলে সাধারণ মধ্যবিত্তকে দলে টানতে চাইছে সরকার। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যুক্তির কোনও অর্থনৈতিক ভিত্তি নেই।

প্রশ্ন উঠবে সিঙ্গুরে কারখানা হলে রাজ্যের কাঁচামালের চাহিদা বাড়বে। কিন্তু সে গুড়ে বালি। গাড়ি তৈরির মূল কাঁচামাল স্টিল আসবে ঝাড়খণ্ডের জামশেদপুর থেকে। এমন কী তা বিদেশ থেকেও আমদানি হতে পারে। সে রকমই অন্যান্য উপকরণও খানিকটা অন্য রাজ্য থেকে আনা হবে। আসলে নন্দীগ্রাম বা সিঙ্গুরে কারখানা হলে কাজ জুটবে। আর কারখানার বাইরে যে কর্মসংস্থান হবে, তা মূলত অসংগঠিত ক্ষেত্রেই।

আধুনিক শিল্পে পুঁজি-নিবিড়তার কারণে 'দক্ষ' শ্রমিকের উৎপাদনশীলতা বেশি। ফলে, অল্প শ্রমিক নিয়োগেই বিপুল পরিমাণ পণ্য ও উদ্বৃত্ত তৈরি করা সম্ভব। এই বিরাট মূল্য যোগের (ভ্যালু অ্যাডেড-এর) একটা অংশ কারখানার ভিতরের শ্রমিকদের ভাগ্যে জোটায় তাদের আয় বাইরের অসংগঠিত ক্ষেত্রের 'অদক্ষ' শ্রমিকদের তুলনায় অনেক বেশি। অর্থনীতির তত্ত্বের সঙ্গেও এটা সঙ্গতিপূর্ণ। পুঁজির নিরিখে দক্ষ শ্রমিকের আয় বাড়াতে পুঁজির প্রয়োজন। পুঁজি এলে বিপুল পরিমাণ পণ্য উৎপাদন হবে, বিরাট পরিমাণ মূল্য যোগ হবে, এটা সত্যি। তার সঙ্গেই তৈরি হবে যথেষ্ট উদ্বৃত্ত। আর বাজার থাকলে, সেই উদ্বৃত্তই পুঁজিপতিকে এনে দেবে বিশাল মুনাফা। এ সব নিয়ে তেমন প্রশ্ন নেই। এটাও মানা যায় যে, পুঁজি বিনিয়োগ মানে কিছু 'দক্ষ' শ্রমিকের ব্যাপক আয় বৃদ্ধি। শহরের উচ্চ শিক্ষিতদের কাছে মোটা মাইনের হাতছানি। কিন্তু এই সুযোগ খুব অল্প কিছু উচ্চশিক্ষিতর ভাগ্যেই জুটবে। কারণ পুঁজির ধর্মই হল বেশি বেশি পুঁজি-ঘন (ক্যাপিটাল ইন্টেনসিভ) উৎপাদন-পদ্ধতির ব্যবহার; আর তার ফলে শ্রমনিয়োগকে ক্রমশ কমিয়ে আনা। ক্রমাগত শ্রমিককে প্রতিস্থাপিত করা যন্ত্রের মাধ্যমে।

অন্যভাবে বললে, আধুনিক শিল্প হলে প্রচুর উৎপাদন হবে। কিন্তু তার মানেই প্রচুর কর্মসংস্থান, এটার কোনও গ্যারান্টিই নেই। ওই বিরাট পরিমাণ পণ্য তৈরি হবে মূলত যন্ত্র-নির্ভর পদ্ধতিতে। সেখানে কর্মসংস্থানের সুযোগ খুবই সীমিত। আর কারখানা হলে বাইরের অসংগঠিত/অনুসারি ক্ষেত্র গড়ে উঠবে ঠিকই কিন্তু সেখানে কাজের কোনও নিরাপত্তা নেই; ভদ্রভাবে বেঁচে থাকার মতো আয়টুকুও নেই।

প্রশ্ন আসবে, একটা কারখানায় না হোক, মুনাফার ক্রম বিনিয়োগের মাধ্যমে আরও আরও কারখানা তৈরি হলে কর্মসংস্থান বাড়তেই থাকবে। কিন্তু মুনাফার আঞ্চলিক পুনর্বিনিয়োগ এবং এ প্রক্রিয়ায় একটা রাজ্যের বা অঞ্চলের মধ্যেই আরও আরও কর্মসংস্থান ক্রমাগত তৈরি করে চলা, অর্থনীতির কোন তত্ত্বে এই স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতির কথা বলা আছে, তা ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিলে সুবিধা হয়। মুনাফার ক্রমাগত বিনিয়োগ ও বেশি বেশি কর্মসংস্থান তৈরি, অর্থনীতির তত্ত্বের নিরিখেই তার কোনও নিশ্চয়তা নেই।

লেখক বিশ্বভারতীর অর্থনীতির অধ্যাপক

বিনিয়োগ এলেই ব্যাপক কর্মসংস্থানের গ্যারান্টি কোথায়

সৌম্য চক্রবর্তী

এখন প্রত্যেক দিন প্রায় প্রতিটা খবরের কাগজের প্রথম পাতায় চোখ রাখলেই দেখতে পাই রাজ্যের 'উন্নয়ন'-এর ভরসা জাগানো বড় বড় সব বিজ্ঞাপন। সরকার গাদা গাদা টাকা খরচ করে সবাইকে এটাই যেন বলতে চাইছে, "আসছে, আসছে, বসন্তের ফুরফুরে বাতাসের সঙ্গেই আসছে উন্নয়ন"!! সকলেরই মনে মনে তাই উন্নয়ন দেখার জন্য একটা চাপা উত্তেজনা, কৌতূহল। কেউ কেউ উন্নয়নের আশ্বাসে আশান্বিত, আবার কারও কারও বা বুক দুরুদুরু উচ্ছেদের আশঙ্কায়। তাই, মহামান্য সরকার অনেক অর্থ ব্যয় করে সবাইকে এই আশ্বাসই দিতে চাইছে যে, এই উন্নয়ন সবার জন্য—"আমাদের জন্য"। বলা হচ্ছে, পিছিয়ে পড়তে পড়তে ক্রমশই যেন আমাদের দম ফুরিয়ে আসছিল। আমরা বাঙালিরা আত্মবিশ্বাস হারাচ্ছিলাম। তাই দরকার ছিল একটা বড় ধাক্কা। সেই জোয়ারে ভেসেই নাকি পশ্চিমবঙ্গবাসী আবার ঘুরে দাঁড়াবে। একটা 'হচ্ছে-হচ্ছে' ভাবকে চারপাশে ছড়িয়ে দিতে পারলেই নাকি বাঙালির তথাকথিত ঘুম ভাঙবে। বাঙালি 'জেগে উঠলে' উন্নয়ন-এর কাণ্ডারী পুঁজিপতিরাও (!) ছুটে আসবে দলে দলে 'উন্নয়ন'-এর পসরা সাজিয়ে। এই প্রক্রিয়া যতই চলতে থাকবে ততই নাকি তার গতি বাড়বে।

পুঁজিপতিরা এলে শিল্প হবে, আর শিল্প মানেই 'উন্নয়ন'! উন্নয়ন মানেই নতুন আশা নতুন উদ্যম, তাই আরও আরও শিল্প। এভাবে একটা প্রক্রিয়া চলতেই থাকবে। এমনটাই সরকারের দাবি।

এই 'ছেলে-ভুলানো' গল্পটার পেছনে আছে কিছু অর্থনৈতিক যুক্তিও। বলা হচ্ছে, শিল্পায়ন প্রক্রিয়া একবার জোরকদমে শুরু হলে একটা আশার সঞ্চার হবে, উৎসাহ উদ্দীপনা তৈরি হবে। তার সঙ্গেই গড়ে উঠবে বড় বড় রাস্তা, ফ্লাই ওভার, পোর্ট, বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী কারখানা, এমন আরও কত কী। কারখানা গড়ে উঠলে একদিকে যেমন পরিকাঠামো হবে, অন্যদিকে আবার বাজারও বিস্তৃত হবে। যুক্তি এই যে, শিল্প এলেই কর্মসংস্থান, আর কর্মসংস্থান মানেই মানুষের হাতে টাকা আসা। মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বাড়লে চাহিদা বাড়বে। ফলে, একদিকে পরিকাঠামো গড়ে ওঠা, আর অন্যদিকে বাজারের বিস্তৃতি। আর এভাবেই নাকি বেসরকারি পুঁজি-নির্ভর শিল্প নিজেই একটা স্বয়ংক্রিয় শিল্পায়ন প্রক্রিয়ার জন্ম দেবে। অনুকূল পরিবেশ তৈরি হলে, তার লোভে আরও আরও শিল্প আসবে, ক্রমাগত নতুন নতুন বিনিয়োগ হবে। তাই একবার ধাক্কা দিয়ে শিল্পায়ন প্রক্রিয়া শুরু করতে পারলে তা নাকি সারা রাজ্যেই ছড়িয়ে পড়বে। ফলে ব্যাপক কর্মসংস্থান তৈরি হবে—হবে 'উন্নয়ন'। এই আশা-ভরসাতেই বুক বেঁধে মানুষকে এখন একটু (!) আত্মত্যাগ করতে হবে ; উচ্ছেদকে মেনে নিতে হবে কোনও এক উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য!

হ্যাঁ, পুঁজি আর পুঁজিপতি বিনিয়োগের অনুকূল পরিবেশ পেলে, সরকারি আশ্বাস পেলে যে দৌড়ে (কিংবা উড়ে) আসবে তাতে সন্দেহ নেই। সস্তায় জমি, জল, বিদ্যুৎ, রাস্তা-ঘাটের সুবিধে, সস্তা অথচ 'দক্ষ' শ্রমিক আর সর্বোপরি 'দুষ্টু' শ্রমিকদের শাসন করা সরকারি লৌহমুষ্ঠি কোন পুঁজিপতি না চায়?

কিন্তু বিনিয়োগ এলেই অমনি ব্যাপক কর্মসংস্থান তৈরি হবে, এই গ্যারান্টি কে দিল? আমরা যে অত্যাধুনিক পুঁজি-নিবিড় শিল্পায়ন করতে চাইছি সেখানে প্রত্যক্ষ কর্মসংস্থানের সুযোগ খুবই কম। পুঁজি-নিবিড় 'টেকনোলজি' ব্যবহার করে ওইসব কারখানা প্রচুর উৎপাদন আর মুনাফা করবে ঠিকই, কিন্তু সেখানে শ্রমিকের দরকার খুবই কম। যন্ত্রই শ্রমকে প্রতিস্থাপিত করবে। প্রচুর উৎপাদন মানেই প্রচুর কর্মসংস্থান, এটা মোটেও নিশ্চিত কিছু নয়। আজকের আধুনিক শিল্পে যন্ত্র ব্যবহার করেই প্রচুর উৎপাদন হয়, সেখানে প্রত্যক্ষ শ্রমিকের তুলনামূলক যোগদান খুবই সামান্য।

হ্যাঁ, শিল্পাঞ্চল গড়ে উঠল সেখানে কিছু ঠিকা কাজের সুযোগ হবে। ছোট ছোট পার্টস তৈরির অসংগঠিত [illegible] কিছু বাজার-দোকান, সাইকেল রিকশা, অটোরিকশা, কারখানার 'বাবু'দের বাড়ির ঝি-চাকর-দরোয়ান, এসব কাজের সুযোগ তৈরি হবে। কিন্তু বলা বাহুল্য, এখানে কাজের কোনও স্থিরতা নেই, নেই ভদ্রভাবে বেঁচে থাকার মতো আয়। সংগঠিত ক্ষেত্রে তথাকথিত দক্ষ শ্রমিকের মাথা পিছু আয় প্রচুর, কিন্তু সেখানে আবার কাজের সুযোগই খুব কম। আর অন্যদিকে, অসংগঠিত ক্ষেত্রে কিছু কর্মসংস্থান হয় ঠিকই, কিন্তু মাথা পিছু আয় সামান্য, তাই সব মিলিয়ে এই ক্ষেত্রের মোট আয়ও বেশি নয়। ফলে সংগঠিত-অসংগঠিত দুটো ক্ষেত্র মেলালেও শ্রমিকের মোট আয় তেমন একটা কিছু নয়। তাই, শিল্প এলেই সব মিলিয়ে সাধারণ মানুষের আয় বাড়বে, ক্রয়-ক্ষমতার ব্যাপক বৃদ্ধি হবে আর তার সঙ্গেই ঘটবে বাজারের বিস্তার, এটা অলীক কল্পনা। আধুনিক প্রযুক্তি-ভিত্তিক শিল্পায়ন প্রক্রিয়া আরও আরও কর্মসংস্থান তৈরি করবে এবং তার ফলে অসংখ্য সাধারণ মানুষের হাতে টাকা আসায় ক্রমাগত নতুন নতুন শিল্প-পণ্যের চাহিদা তৈরি হবে, এই চুঁইয়ে পড়ার তত্ত্বটা তো কবেই আবর্জনা হয়ে গেছে। তাই শিল্প এলে আপনিই নতুন শিল্পের বাজার তৈরি হবে, ফলে সেই বাজারের লোভেই আরও আরও শিল্প আসবে, এই যুক্তির গোড়ায় গলদ।

প্রশ্ন উঠবে, একবার শিল্পায়ন প্রক্রিয়া শুরু হলে সাধারণ মানুষের নিত্য-প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের চাহিদা তেমন একটা না বাড়লেও কাঁচামাল আর উপকরণের চাহিদা বাড়বেই। ফলে সেই সব কাঁচামাল সরবরাহ ও উপকরণ তৈরির জন্য শিল্প হবে। প্রথম কথা হল, সেই শিল্প এ-রাজ্যেই হতে হবে এমন কোনও বাধ্যবাধকতা আছে কি? অন্য রাজ্য, এমনকী অন্য দেশ থেকেও উপকরণ আর কাঁচামাল আমদানি হতেই পারে। আর সবচেয়ে বড় কথা, সেই সব শিল্প-পণ্য এখানে তৈরি হলেও তাতে যে ব্যাপক কর্মসংস্থান হবেই এটা কে বলে দিল? এর গ্যারান্টি কোথায়? সিঙ্গুরে টাটার সঙ্গে আসবে ইতালির ফিয়াট আর অনুসারি ক্ষেত্রের রাঘব বোয়াল বাবা কল্যাণীর ভারত ফোর্জ। কর্মসংস্থানটা হবে কোথায়!

কেউ বলতে পারেন, প্রথম ধাক্কায় অনেকটা বিনিয়োগ হলে পরিকাঠামো, যেমন রাস্তাঘাট, বিদ্যুৎ ইত্যাদিতে একটা জোয়ার আসবে। নতুন নতুন রাস্তা, পোর্ট এসব একবার তৈরি হলে, তার টানেই আরও আরও বিনিয়োগ আসবে। ফলে শিল্প এলে পরিকাঠামো হবে, আবার সস্তা অথচ উন্নতমানের পরিকাঠামোর আকর্ষণে নতুন শিল্প আসবে। এভাবে নাকি চলতেই থাকবে। কিন্তু এ-সুযোগও সীমিত। দেশের অন্যান্য শিল্পোন্নত রাজ্যে তো ইতিমধ্যেই পরিকাঠামোর সমস্যা শুরু হয়েছে। আর বেসরকারি পুঁজি পরিকাঠামো তৈরির থেকে সরকারের বানিয়ে দেওয়া রেল-রাস্তা-পোর্ট ব্যবহার করাই বেশি পছন্দ করে—এ আমরা অর্থনীতির তত্ত্ব থেকেই বুঝি। এসব তৈরির খরচ বিশাল, দ্বিতীয়ত এগুলো হল 'পাবলিক গুড', তাই এসবের দাম নির্ধারণ খুবই শক্ত ব্যাপার। তাই বেসরকারি শিল্প এলে আপনিই পরিকাঠামো উন্নততর হবে, বেসরকারি পুঁজির উপর এতটা ভরসা কি রাখা যায়?

সব শেষে আসে প্রাকৃতিক সম্পদের প্রশ্ন। বিশাল বিশাল পুঁজি নিবিড় কারখানা করে বিপুল বেকার বাহিনীর (৭০ লক্ষের ওপর নথিভুক্ত বেকার) জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টির অনেক আগেই রাজ্যের সব প্রাকৃতিক সম্পদ নিঃশেষ হয়ে যাবে না তো? পুঁজি চাইলে আবার পাওয়া যায়, জমি-জল-পরিবেশ একবার গেলে কিন্তু ফেরত পাওয়া প্রায় অসম্ভব!

(লেখক বিশ্বভারতীর অর্থনীতির অধ্যাপক)

রবে উল্টোদিকে

প্রতিদিনের চিঠি

কোনওভাবেই সমর্থনযোগ্য নয়। এই ব্যাপারে [illegible]

সত্যিই অতি সাধারণ এক বাজেট

সৌম্য চক্রবর্তী

এটা সত্যিই অতি সাধারণ একটা বাজেট। আয় ও ব্যয়ের যে হিসেব থাকে এখানে তা নিয়ে ভাবার মতো কিছু নেই।

এবারের বাজেটে এই ভাবার মতো কিছু না থাকাটাই সবচেয়ে বড় গণ্ডগোলের। ভারতীয় অর্থনীতির বর্তমান অবস্থাটা সরকারের হস্তক্ষেপের পক্ষে যেমন যথেষ্ট অনুকূল, সেরকমই বিশেষ কিছু করার থাকলে তা ভীষণ, ভীষণ জরুরিও বটে।

এখন ভারতীয় অর্থনীতির সার্বিক বৃদ্ধির হার যথেষ্ট ভাল। এ বছরে তা ৯.২ শতাংশ (গত তিন বছরের গড় ৮.৬ শতাংশ)। উৎপাদন শিল্প ও পরিষেবায় এই হার ১০-১১ শতাংশের উপরে। এইসব ক্ষেত্রের সঙ্গে যাঁরা যুক্ত হতে পেরেছেন, সেইসব ভাগ্যবানেদের আয়ও বেড়েছে অনেকটাই। মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের (জিডিপি) ২৬ শতাংশের উপর আসছে উৎপাদন শিল্প থেকে। ৫৫ শতাংশের মতো আসছে পরিষেবা ক্ষেত্র থেকে। অর্থাৎ এই দুই ক্ষেত্রে মিলিয়ে ৮০ শতাংশের বেশি যোগদান করছেন জিডিপিতে। এই দুটি ক্ষেত্রই বাড়ছে ভয়ঙ্কর দ্রুতগতিতে। ফলত সমাজের একটা অংশের আয় বৃদ্ধি যে ঘটছে সেকথা সত্যি।

এর ছাপ পড়ছে সরকারের আয়ের উপরেও। কর ও অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের অনুপাত ১০.৩ শতাংশ থেকে বেড়ে হয়েছে ১১.২ শতাংশ। অর্থাৎ সরকারের হাতে খরচ করার মতো কিছু টাকা এসেছে। এর সুফল সমাজের সর্বত্র ছড়িয়ে দেওয়ার সদিচ্ছা থাকলে এটাই সরকারের পক্ষে বোধহয় সুবর্ণ সুযোগ।

কিন্তু এর বিপরীতে রয়েছে অশনি সঙ্কেত। গত আর্থিক বছরে (২০০৬-০৭) কৃষি বৃদ্ধির হার মাত্র ২.৭ শতাংশ (দশ বছরের গড় ২.৩ শতাংশ)। সবচেয়ে যেটা মারাত্মক জিডিপিতে কৃষি যোগদান কমে হয়েছে মাত্র ১৮ শতাংশ। মনে রাখতে হবে মোট কর্মনিয়োগের ৫৫ শতাংশই কিন্তু এখনও হয় কৃষিক্ষেত্রে। এর ফল একটাই, বিপুল জনসংখ্যা কৃষির উপর নির্ভর করতে বাধ্য। কিন্তু সেখানে আয় বৃদ্ধি প্রায় নেই বললেই চলে। নিয়োগের দিক থেকে আর একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক ক্ষুদ্রশিল্পের বৃদ্ধির হারও খুবই কম, ৪.৪ শতাংশ। বড় সংগঠিত শিল্প ও পুঁজিনিবিড় পরিষেবার যে হারে বৃদ্ধি হয়েছে, সেই অনুপাতে কর্মনিয়োগ তো হয়ইনি, উল্টে কোথাও কোথাও কমেছে। আমরা পেয়েছি 'জবলেস গ্রোথ' (কর্মহীন বৃদ্ধি)।

শিল্প পরিষেবায় উৎপাদন ও আয় বেড়েছে। সেইসঙ্গে বেড়েছে শিল্পের কাঁচামাল ও কৃষিপণ্যের বিশেষ করে খাদ্যের চাহিদা। অথচ এদের উৎপাদন সেভাবে বাড়েনি। তাই যথেষ্ট জোগানের অভাবে হু হু করে দাম বাড়ছে নিত্যপ্রয়োজনীয় খাবার দাবার ও উপকরণের (সিমেন্ট, লোহা ইত্যাদি)। খাদ্যশস্যের পাইকারি মূল্যসূচক বেড়ে হয়েছে ১২.০২ শতাংশ। আর খনিজ পদার্থে ১৮.২৩ শতাংশ। সব মিলিয়ে মুদ্রাস্ফীতি একটি বিরাট বিপদসঙ্কেত।

একদিকে উৎপাদন শিল্প ও পরিষেবার বৃদ্ধি, অন্যদিকে কৃষিক্ষেত্রের আয় খুব অল্প। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে কর্মহীনতা ও মূল্যবৃদ্ধি। এই সময় উচিত ছিল বাজারি অর্থনীতির গভীরে প্রবেশ করা। উচিত ছিল কৃষিতে ব্যাপক বিনিয়োগ ঘটানো। ২৪ লক্ষ হেক্টর জমি সেচের আওতায় আনা হবে, এমন আশ্বাস ছাড়া তেমন কিছুই চোখে পড়ল না। দরকার ছিল ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্পের ব্যাপক বিস্তার, যাতে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষি লাভবান হয়। বর্ষা ও মাটির নিচের জলের উপর নির্ভরতা কমে। দরকার ছিল শস্য সরবরাহের জন্য প্রচুর বিনিয়োগ। দরকার ছিল প্রক্রিয়াকরণ ও বিপণন ব্যবস্থার ব্যাপক উন্নতির। পুঁজিনির্ভর ব্যক্তিগত সেচ ও প্রক্রিয়াকরণ পদ্ধতিতে ব্যবহৃত যন্ত্রের উপর আমদানি শুল্কের ছাড় বাদে তেমন কিছুই পেলাম না আমরা। গ্রামীণ রাস্তা কিংবা বাজারের ব্যবস্থা করার কথা উহ্যই থেকে গেল। শুধু ফরোয়ার্ড ট্রেডিং করে কিছুটা সেচ বাড়িয়ে, বীজের চাষে বিদেশি বিনিয়োগ এনে কিংবা সারের ভরতুকি দিয়ে কি খাদ্যের জোগানের সমস্যা মেটানো যাবে? মনে হয় না। এটা কি অতই সহজ?

কৃষি ঋণ বেড়েছে ঠিকই। কিন্তু কৃষিপণ্য ঠিকঠাক দামে ঠিকঠাক সময়ে বেচতে না পারলে সেই ঋণ নিয়ে তো আরও বিপদে পড়বেন কৃষকরা। খাদ্যের অবাধ আমদানি-রফতানি বন্ধ না হলে দেশের খাবার দেশের মানুষের হাতের বাইরে চলে যাবে। এ নিয়ে ফাটকা চলবে। আর ভরতুকি তো পৌঁছতে হবে সব মধ্যস্বত্বভোগীর হাত পেরিয়ে ছোট চাষির কাছে। এই বাজেটে কৃষি সমস্যার সুষ্ঠু সমাধানের পথ পেলাম না। সব থেকে আশ্চর্য, এই নিদারুণ খাদ্য সঙ্কটের সময়ে গণবণ্টন ব্যবস্থা এক টাকাও জোগাড় করা গেল না। অথচ অস্ত্রশস্ত্রের জন্য প্রায় এক লক্ষ কোটি টাকা। সব থেকে হতাশ করল কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে উদ্যোগের অভাব। গ্রামীণ নিয়োগ কিংবা বিমা প্রকল্প তো আর স্বনির্ভর উদ্যোগ তৈরি করবে না। এক্ষেত্রে দরকার ছিল ক্ষুদ্র শিল্প, বিশেষত অসংগঠিত ক্ষেত্রের জন্য বিশেষ প্যাকেজ। জনসংখ্যার যে বিশাল অংশ গ্রাম শহরের অসংগঠিত অ-কৃষিক্ষেত্রে যুক্ত, তাদের জন্য বাজেটে একটি কথাও নেই। এই বিশাল ক্ষেত্রকেই সবার আগে বিশেষভাবে সাহায্য করা দরকার। কোটি কোটি মানুষ যে অন্যান্য অসংগঠিত শিল্প পরিষেবায় যুক্ত, সেটা সরকার বেমালুম ভুলে গেল। এদের সংগঠিত করার জন্য দরকার সস্তার উপকরণের ব্যবস্থা। বাজারের ব্যবস্থা। গবেষণা ও ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা। এদের এক জায়গায় জড়ো করতে পারলে এরাও আর্থিক বৃদ্ধি তৈরি করতে পারে। এবং সেখানে ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হতে পারে। সরকার কিন্তু এসব ভাবল না। হয়তো ভাবার মন নেই। 'যেমন চলছে চলবে'। আসল ইচ্ছেটা কি তাই?

লেখক বিশ্বভারতীর অর্থনীতির অধ্যাপক

গণহত্যার পিছনে গভীর অর্থনৈতিক ষড়যন্ত্র রয়েছে

সৌম্য চক্রবর্তী

"এ জল্লাদের উল্লাসভূমি আমার দেশ না/ এ মৃত্যু-উপত্যকা আমার দেশ না"! না, আজ আর অর্থনীতি চর্চা করা যাচ্ছে না। বিতর্কটা অর্থনীতির গণ্ডি ছাড়িয়ে সমাজের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ছে। রাজনীতির বাইরেও সাধারণ মানুষ, বিশেষ করে বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে অবস্থান নেওয়ার একটা প্রবণতা তৈরি হচ্ছে। যার মান ও হুঁশ এই দুটো বিন্দুমাত্রও আছে ঘটে যাওয়া গণহত্যার বিরুদ্ধে আজ তার সরব হওয়ার সময়। দুঃখের বিষয় এই দুঃসময়েও হিসাবগুলোকে গুলিয়ে দেওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা হচ্ছে একই সঙ্গে। আর সেটা নিষ্ঠুরভাবে করছেন বুদ্ধিজীবীদের একটা ক্ষুদ্র অংশও। সীমাহীন সঙ্কীর্ণতার প্রকাশ ঘটছে কিছু সংবাদপত্রের প্রবন্ধে, দূরদর্শনের পর্দায়।

বীভৎস গণহত্যার বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণার বদলে তাঁরা সুক্ষ্মভাবে রাজনীতি করছেন, একবিংশ শতকের আগ্রাসী পুঁজিবাদ আর ছদ্ম-বামপন্থার কুৎসিত সম্পর্কটাকে লুকিয়ে ফেলার রাজনীতি। সুচতুরভাবে এই গণহত্যা আর রাজ্যের তথাকথিত 'শিল্পায়ন/উন্নয়ন' প্রক্রিয়াকে বিচ্ছিন্ন করে দেখানোর কাজে তাঁরা নেমে পড়েছেন। বলছেন, এই পুলিশি হামলা খারাপ, কিন্তু তাই বলে শিল্পায়ন থেকে সরে এলে চলবে না; পুলিশি অত্যাচার নিন্দনীয় কিন্তু 'ব্র্যান্ড বুদ্ধ'-কে চাই। চমৎকার! শাসকের রাজনীতি তো এটাই, সব সময় একই প্রক্রিয়ার বিভিন্ন অংশগুলোকে বিচ্ছিন্ন করে দেখানোর চেষ্টা যাতে মানুষ বিভ্রান্ত হয়। কিছু অর্থনীতিবিদ বলছেন এই গণহত্যা শুধুই পদ্ধতিগত সমস্যা, পুঁজি নাকি কখনওই এসব গণ্ডগোল চায় না। তারা সুষ্ঠু প্রতিযোগিতার একটা অলীক ছবি খাড়া করার চেষ্টা করছেন। আসলে সাধারণ সময়ে পুঁজির ভয়ঙ্কর মুখটা লুকনোই থাকে, কিন্তু ভুলব কী করে এই পুঁজিবাদই দু-দুটো বীভৎস বিশ্বযুদ্ধ ঘটিয়েছে। আর আজকের বড় পুঁজির আক্রমণ অনেক জটিল, অঙ্কগুলো অনেক ঘোরালো। অথচ প্রশ্নগুলোকে লুকিয়ে ফেলার দলে নেমে পড়েছেন বুদ্ধিজীবীদের একটা অংশ।

এমনই কিছু 'অ-সাধারণ' মানুষের অর্থনীতি চর্চা দেখে আর স্থির থাকতে পারলাম না। অত্যন্ত সচেতনভাবে এই ভয়ঙ্কর সময়েও এঁরা আমাদের বোধগুলোকে গুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছেন। বলার চেষ্টা করছেন এই গণহত্যা নাকি শুধুই পুলিশ কিংবা রাজনীতির খেলা। এর পিছনের গভীর অর্থনৈতিক ষড়যন্ত্রটা তাঁরা ঢেকে ফেলতে চাইছেন। তাঁরা বলছেন, শিল্পায়ন মানেই তো উন্নয়ন,তা কি কখনও এই অপরাধ ঘটাতে পারে? কেমন শিল্পায়ন, কারা তার কাণ্ডারী, কীসের শিল্প, কার জন্য শিল্পায়ন— এসব প্রশ্ন চেপে যাওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। ভুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে, এই বড় পুঁজির শিল্পায়নেরই আর এক পিঠ উচ্ছেদ। এক বিরাট অংশ মানুষের জীবন-জীবিকা-সংস্কৃতি সমস্ত কিছুর উচ্ছেদ ছাড়া এই চাপিয়ে

চেষ্টা করছেন এই গণহত্যা নাকি শুধুই পুলিশ কিংবা রাজনীতির খেলা। এর পিছনের গভীর অর্থনৈতিক ষড়যন্ত্রটা তাঁরা ঢেকে ফেলতে চাইছেন। তাঁরা বলছেন, শিল্পায়ন মানেই তো উন্নয়ন,তা কি কখনও এই অপরাধ ঘটাতে পারে? কেমন শিল্পায়ন, কারা তার কাণ্ডারী, কীসের শিল্প; কার জন্য শিল্পায়ন— এসব প্রশ্ন চেপে যাওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। ভুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে, এই বড় পুঁজির শিল্পায়নেরই আর এক পিঠ উচ্ছেদ। এক বিরাট অংশ মানুষের জীবন-জীবিকা-সংস্কৃতি সমস্ত কিছুর উচ্ছেদ ছাড়া এই চাপিয়ে দেওয়ার শিল্পায়ন হতে পারে না।

চাষির উচ্ছেদেই পাওয়া যাবে জমি, ছোট উদ্যোগ ধ্বংসের মাধ্যমেই পাওয়া যাবে শিল্প-পণ্যের বাজার, চাষের জোনের অবলুপ্তির মধ্যে দিয়েই তৈরি হবে হবু 'ঝি-চাকর-দারোয়ান'-এর দল— উদ্বৃত্ত অসংগঠিত শ্রমিক বাহিনী। একেই কি বলে উন্নয়ন? এই পুঁজিকেন্দ্রিক শিল্পায়নের সবচেয়ে বড় উদ্দেশ্য যে বিপুল মুনাফা অর্জন তা নিয়ে অর্থনীতির ইতিহাসের সামান্য পাঠ নেওয়া কোনও ব্যক্তির সন্দেহ থাকতে পারে না। অবশ্য কেউ যদি জেগে ঘুমোয়, জেনেও অন্য কথা বলে তবে তাকে অসৎ আখ্যা দেওয়া ছাড়া অন্য পথ থাকে না।

পুঁজিপতির বিপুল মুনাফার সম্ভাবনাকে আড়াল করতে সরকারের লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে বিজ্ঞাপন দিয়ে শিল্পায়নের মাধ্যমে ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টির মিথ্যে প্রচার চলছে। মধ্যবিত্তের কাঁধে জুতে দেওয়া হচ্ছে দু-দুটো 'খুড়োর কল'— একটা সস্তা (?) চটকদার পণ্যের আর একটা কর্মসংস্থানের। অথচ এইসব পুঁজিনিবিড় শিল্পে বিরাট পরিমাণ পণ্য উৎপাদন হলেও সেখানে কর্মসংস্থানের সুযোগ খুব কম। তাই আপামর জনগণ শিল্পায়নের জোয়ারে ভেসে চাকরি পাবে আর সেই চাকরির জোরে গাড়ি চড়বে, তাজা ফল-সবজি খাবে এই পুরো গল্পটাই একটা বানানো গল্প। একটা মিথ্যে স্বপ্নকে বিক্রি করার চেষ্টা। খবরের কাগজে দেখলাম এক নেতা বলেছেন, রাজ্যের সব গ্রামে নাকি ১০টা করে মোটর গাড়ি থাকবে আর সেটাই নাকি আমাদের গর্বের বিষয়। মাত্র ১০টা গাড়ি! বাকি মানুষগুলো কি তা হলে হিসাবের বাইরেই চলে গেল। ওই ভাগ্যবান দশ-বিশটা পরিবারের উন্নতিই কি তা হলে 'উন্নয়ন'? এটা গর্বেরই বটে! ঠিক যেমন জমিদার কিংবা গ্রামের মুরুব্বি কতগুলো পায়রা ওড়াল, টিয়া পাখির বিয়েতে কতজন ব্রাহ্মণ খাওয়ানো হল তাই দিয়ে এক-সময় নিরন্ন প্রজার সম্মান নির্ধারণ করার গল্প শোনানো হত। আজকের গভীরতম সমস্যাটা সম্ভবত এখানেই। শ্রেণি-অবস্থানগুলোকে গুলিয়ে দিতে একটা মিথ্যে পরিচয় তৈরি করা। 'বেঙ্গল শাইনিং'-এর প্রচারের আড়ালে ক্ষতগুলোকে লুকিয়ে ফেলার আপ্রাণ চেষ্টা। 'উন্নয়ন'-এর মোড়কে পুঁজিবাদী আগ্রাসনকে রাজ্যের শিরায় শিরায় বইয়ে দেওয়ার চেষ্টা।

এই শিল্পায়নের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হল উচ্ছেদ। আর উচ্ছেদেরই চরম প্রকাশ এই গণহত্যা। তাই 'শিল্পায়ন = উন্নয়ন' এই সমীকরণটা বোঝানোর বিশ্রী চেষ্টা চলছে যাতে এই উচ্ছেদকে মানিয়ে নেওয়া যায়। যুক্তিটা এমন, শিল্পায়ন হলেই উন্নয়ন— অগ্রগতি, তাই কিছু (!) উচ্ছেদ মেনে নিতে হবে; বাড়াবাড়ি হলে শুধু একটা প্রতিবাদ! এই রাজনীতিটা আসলে অর্থনীতির একটা মিথ্যে গল্পের উপর দাঁড় করানো হচ্ছে। পুঁজিবাদী শিল্পায়ন মানেই অগ্রগতি এটা প্রচার করতে তাই নেমে পড়েছে। কিছু তথাকথিত বুদ্ধিজীবী। 'চাপিয়ে দেওয়া পুঁজিবাদী শিল্পায়ন = উচ্চবিত্তের উন্নয়ন = ব্যাপক উচ্ছেদ আর গণহত্যা।"

লেখক বিশ্বভারতীর অর্থনীতির অধ্যাপক

ন : ২২১২-৮৪০০ - ০৫ ফ্যাক্স : ২২১২-৬০৩৬/৩১
লিফ্যাক্স (০৩৫৩) ২৬৪২৬৪৫
৬২০১

. Publications Pvt. Ltd. 20, Prafulla Sarkar Street,
plex 2nd floor, Sevak Road, Siliguri - 734001.
256201

খুচরো ব্যবসায় জরুরি আদর্শ ও উন্নয়ন ভাবনা

সৌম্য চক্রবর্তী

খবরের কাগজে আমরা দেখেছিলাম খুচরো ব্যবসায় বিদেশি বিনিয়োগের সপক্ষে যোজনা কমিশনের প্রস্তাবের নাকি কড়া সমালোচনা করেছে রাজ্যের প্রধান সরকারি দলটি। কারণ, তারা নাকি সার্বিকভাবেই বিদেশি বিনিয়োগের বিপক্ষে। দ্বিতীয়ত, এই ক্ষেত্রে যেহেতু অসংখ্য মানুষ নানাভাবে যুক্ত এবং এর বেশিরভাগটাই অসংগঠিত, তাই বিদেশি বিনিয়োগ ব্যাপক কর্মচ্যুতি ঘটাবে, এটাই নাকি ছিল মূল আশঙ্কা।

'খুচরো ব্যবসা-শৃঙ্খল' খেত-খামার (কিংবা ছোট কারখানার গেট) থেকে পাড়ার ছোট দোকান পর্যন্ত বিস্তৃত। পণ্য চলাচলের এই বিরাট ডালপালা মেলা প্রক্রিয়ায় অনেক ধাপ আছে। পণ্য বিনিময় (সরবরাহ)-এর এই প্রতিটি ধাপই মূলত শ্রম-নির্ভর। তাই পুরো পদ্ধতিটার সঙ্গে যুক্ত রয়েছে অংসখ্য মানুষ।

পশ্চিমবঙ্গে সংখ্যাটা প্রায় ১০/১২ লক্ষ। অথচ আশ্চর্যের ব্যাপার এটাই, স্রেফ অর্থনৈতিক বিস্তারের হাত ধরে অনেকটা আপনা থেকেই গ্রাম-শহর সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে এই বিরাট ব্যবসার শৃঙ্খল এবং প্রায় কোনওরকম সরকারি সহায়তা ছাড়াই। এই 'রিটেল ট্রেড'-এর বিস্তৃত প্রক্রিয়ায় নিজেদের জীবিকা খুঁজে নিয়েছে লক্ষ লক্ষ মানুষ, সম্পূর্ণ স্ব-উদ্যোগে। এটা ঠিকই যে পুঁজি নির্ভর কৃষি-শিল্প-পরিকাঠামোর অগ্রগতি আর নগরায়ণ প্রক্রিয়া খুচরো ব্যবসা বাড়তে সাহায্য করেছে, কিন্তু তার বাইরে বড় পুঁজির উপস্থিতি এখানে খুবই কম। প্রায় পুরো কর্মকাণ্ডটাই চলে লক্ষ লক্ষ খেটে-খাওয়া মানুষের কাঁধে ভর করে। এই বিরাট অসংগঠিত 'বাজার' (বিনিময়) ব্যবস্থার কথা 'বাজারি' অর্থনীতির আলোচনায় কিংবা সরকারি নীতিতে প্রায় খুঁজেই পাওয়া যায় না। তা হলে কি এটাই সত্যি যে, ছোট উদ্যোগ আর শ্রম-নির্ভর হওয়ার কারণেই এই বঞ্চনা? এমনকী, বাজার-ব্যবস্থার সমর্থকদের কাছে এই বিরাট বিনিময়-শৃঙ্খল ব্রাত্য? তা হলে কি বড় পুঁজির জয়গানই শেষ কথা! এমনকী, রাজ্য সরকারও এই ভাবনার বাইরে নয়। না হলে খুচরো ব্যবসায় দেশি-বিদেশি দৈত্যাকার সব সংস্থাকে ডেকে আনা হচ্ছে কেন? এদের জন্য তৈরি হচ্ছে বিরাট পরিকাঠামো। আর সে-কাজে সরকার হাত লাগাচ্ছে! বিরাট সংস্থাগুলো বিপুল পুঁজির অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে ছোট উদ্যোগনির্ভর খুচরো ব্যবসার বাজারটাকে যে দারুণ বিপদে ফেলবে, সেটা কি সরকারি কর্তারা বোঝেন না?

সকালবেলা বাড়ি বাড়ি কাগজ কিংবা দুধ পৌঁছে দেওয়া থেকে শুরু করে বাজারের শাক-সবজি-ফল-ফুল-মাছ-মাংস বিক্রি, রেলের হকারি, মুদিখানার জিনিসপত্র বিক্রি, শহরের ফুটপাতে কিংবা অস্থায়ী গ্রাম্য হাটে জামা-কাপড়, বাসনপত্র, রকমারি জিনিস কেনাবেচা এ সব তো আমরা চোখের সামনে দেখতেই পাই। যেটা দেখতে পাই না সেটা সম্ভবত আরও বড় একটা প্রক্রিয়া খেত-খামার কিংবা ছোট শিল্পোৎপাদকের উৎপাদন।

সংগ্রহ, ঝাড়াই-বাছাই, প্যাকেজিং-লেবেলিং কিংবা খাদ্যের প্রক্রিয়াকরণের পর তা বিক্রেতাদের হাতে আসা পর্যন্ত প্রতিটি ধাপেই থাকে বহু খেটে খাওয়া মানুষ। তাদের না আছে সংগঠনের জোর না সরকারি সহায়তা। ভোর রাতের ট্রেনে, লরিতে, টেম্পো কিংবা ঠেলায় হাওড়া, বড়বাজার, শিয়ালদহ, মানিকতলা, বেহালা এমন আরও কত বাজারে যে বিপুল পরিমাণ জিনিসপত্র পৌঁছে যায় তার পিছনে থাকে এই বিরাট অসংগঠিত ক্ষেত্রই। তা ছাড়া রাজ্যের প্রতিটি ছোট-বড় শহরে প্রতিদিনকার খাবার আর অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের জোগানও আসে একই পদ্ধতিতে। এমনকী, বড় গ্রামের বাজারগুলোতে এরাই পৌঁছে দেয় দৈনন্দিন ব্যবহারের যাবতীয় পণ্যসামগ্রী। এই পুরো প্রক্রিয়ার মধ্যে প্রতিদিনকার ব্যবহারের শাক-সবজি-দুধ-ফল কিংবা মাছ-মাংসের চলাচল একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং বড় অংশ। এর প্রায় প্রতিটি ধাপই নিয়ন্ত্রণ করে বড় আড়তদাররা; তারাই লাভের সিংহভাগ দখল করে। কিন্তু পণ্য চলাচলটা হয় মূলত অসংগঠিত শ্রমিক বাহিনীর উপর নির্ভর করেই। সহজেই বোঝা যায়, রাজ্যে এই কর্মযজ্ঞে কী বিরাট সংখ্যায় মানুষ যুক্ত।

এর কতকগুলো সমস্যার দিকও আছে। যেমন আড়তদারদের দাপটে চাষি কিংবা ছোট শিল্পোৎপাদক ঠিকঠাক দাম পায় না। ক্রেতাও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাকে মাত্রাছাড়া দাম দিয়ে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য কিনতে হয়। তা ছাড়াও পরিকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম হওয়ায় ২০-২৫ শতাংশ পচনশীল পণ্য নষ্ট হয়। খাদ্য-প্রক্রিয়াকরণের প্রচুর সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও তা ঠিকমতো করা যায় না। অর্থাৎ এক কথায়, পরিকাঠামো আর প্রয়োজনীয় সংগঠনের অভাবে প্রচুর সম্ভাবনা নষ্ট হয়, আড়তদাররা লাভের বড় অংশ আত্মসাৎ করে, ক্রেতা অনাবশ্যক বেশি দাম দিতে বাধ্য হলেও পণ্য, উৎপাদক যথেষ্ট দাম পায় না।

সরকার যদি সঠিক পরিকাঠামো যেমন দূর-দূরান্তে রাস্তাঘাট, (বিশেষত গ্রামীণ রাস্তা) বিদ্যুতের ব্যবস্থা, হিমঘর, পরিকল্পিত বাজার এ সব তৈরি করে দিত আর তার সঙ্গেই চলতি অসংগঠিত প্রক্রিয়াটিকে সংগঠিত করে তুলত অসংখ্য আঞ্চলিক পণ্যসংগ্রহ পরিবহন-বিপণন সমবায় গঠন আর সেগুলোর সমন্বয়ের মাধ্যমে, তা হলে এই সব সমস্যা অনেকটাই হয়তো কাটানো সম্ভব হত। তার সঙ্গেই সরকারি/সমবায় ব্যাঙ্কগুলোকে এই সব নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য চলাচলের মাধ্যম হিসেবে গড়ে তোলা সমবায়গুলোর সঙ্গে যুক্ত করতে হত, যাতে এই সমবায় সহজেই প্রয়োজনীয় পুঁজি পেতে পারে। প্রতিটি অঞ্চল থেকে এবং প্রতিটি প্রত্যন্ত অঞ্চলে পণ্য পৌঁছনোর কাজটা প্রাথমিকভাবে করত ওই সব অঞ্চলের সংগ্রহ-পরিবহন-সরবরাহে যুক্ত সমবায়গুলোই। আর সেই সমস্ত আঞ্চলিক সমবায়ের নেটওয়ার্ক (যোগাযোগ)-এর মাধ্যমেই রাজ্যের 'রিটেল ট্রেড'-কে সংগঠিত করার চেষ্টা করা যেত। পরিকাঠামোগত ও সংগঠনগত উন্নয়ন ঘটিয়ে এই প্রক্রিয়ার কর্মদক্ষতাও বাড়ানো যেত। তাতে এর সঙ্গে যুক্ত কর্মীদের আয়ও বাড়ত। অসংখ্য মানুষের উন্নতির একটা রাস্তা হয়তো মিলত। অন্যদিকে, চাষি কিংবা ছোট শিল্পোৎপাদক যেমন পণ্যের সঠিক মূল্য পেত, তেমনই আড়তদারদের দৌরাত্ম্য বন্ধ হলে ক্রেতাও ন্যায্য দামে জিনিস কিনতে পারত।

তবে এই প্রক্রিয়ায় যে একমাত্র সমাধান তা না-ও হতে পারে। পুরোটাই আসলে একটা চর্চা ও প্রয়োগের বিষয়; কোনও রেডিমেড সমাধান সূত্র এখানে নেই। তবে সমাধান খুঁজতে গেলে প্রথমেই দরকার একটা অর্থনৈতিক/রাজনৈতিক দিশা। আর সম্ভবত তার চেয়েও বেশি জরুরি সঠিক আদর্শগত অবস্থান, যেখানে সমস্ত সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রেই থাকবে মানুষের সত্যিকার উন্নয়ন-ভাবনা। এই আদর্শগত অবস্থান না থাকলে ওই বিরাট কর্মযজ্ঞকে—তার সমস্যাগুলোকে—তাত্ত্বিকভাবে বোঝা এবং সে-অনুসারে সংগঠিত করা অসম্ভব। তা শুধুমাত্র ঠ্যাঙাড়ে ক্যাডারবাহিনী দিয়ে সম্ভব নয়!

লেখক বিশ্বভারতীর অর্থনীতির অধ্যাপক

তাজা ফল-মাছ-সবজি ও অন্যরকম উচ্ছেদের গল্প

সৌম্য চক্রবর্তী

খবরের কাগজে দেখলাম কয়েকদিনের মধ্যেই কলকাতার ইস্টার্ন বাইপাসের ধারে বহুজাতিক সংস্থা 'মেট্রো ক্যাশ অ্যান্ড ক্যারি' তার বিশাল পাইকারি বিক্রয়-কেন্দ্রটা খুলতে চলেছে। ৮০ কোটি টাকা খরচ করে তৈরি হচ্ছে এক লক্ষ বর্গফুটের বিপণনকেন্দ্র। তা ছাড়াও থাকবে সবজি-মাছ-ফল ইত্যাদির বিরাট সংরক্ষণব্যবস্থা। খুচরো বিক্রেতাকে মালপত্র পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্বও নেবে সংস্থাটি। উল্টো দিকে, নিত্যপ্রয়োজনীয় কৃষি ও শিল্প-পণ্য উৎপাদকদের থেকে সংগ্রহ করে প্রক্রিয়াকরণ ও 'প্যাকেজিং'ও তারাই করবে। এমনকী, চাহিদা অনুযায়ী উৎপাদকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও করবে এই জার্মান বহুজাতিক।

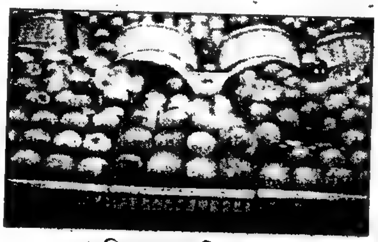

আধুনিক খুচরো বিপণন কেন্দ্র

অর্থাৎ, এই কর্মকাণ্ডের একদিকে থাকবে খুচরো বিক্রেতারা আর অন্য প্রান্তে থাকবে কৃষি ও শিল্প পণ্য উৎপাদকরা। ছোট উৎপাদককে দিয়ে বাজারের চাহিদামতো পণ্য তৈরি করিয়ে তা সংগ্রহ করা, তার পর 'প্রসেসিং', 'গ্রেডিং', 'প্যাকেজিং' করে খুচরো ব্যবসায়ীদের সরবরাহ করা; এই বিশাল পণ্য বিনিময়-শৃঙ্খলে তাদের উপস্থিতি প্রতিষ্ঠা করতে আসছে দৈত্যাকার বহুজাতিক।

কী বিশাল এই উপস্থিতি তা কয়েকটা হিসেবেই বোঝা যায়। এই পাইকারি বিপণনকেন্দ্রে ১৮০০০(!) পণ্য কিনতে পারবে খুচরো বিক্রেতারা; পরিবহন ও সরবরাহ নিয়েও মাথা ঘামাতে হবে না। ইচ্ছেমতো অর্ডার দিলেই মালপত্র পৌঁছে যাবে। ইতিমধ্যেই প্রায় ৮০,০০০ খুচরো দোকানদারদের সঙ্গে ফলপ্রসূ আলোচনা সেরেছে মেট্রো, তেমনটাই খবরে প্রকাশ। কলকাতা শহরের প্রায় এক লক্ষ (!) খুচরো ব্যবসায়ী/দোকানদার এখন থেকে শিয়ালদহ, বড়বাজার কিংবা বেহালার পাইকারি বাজারের পরিবর্তে মেট্রোর পাইকারি-বিপণন কেন্দ্র থেকেই জিনিস কিনতে পারবে। উল্টোদিকে, এই প্রক্রিয়ায় নাকি ছোট চাষি আর ছোট / মাঝারি শিল্পোৎপাদকদের লাভ। কারণ, তারা ঠিকঠাক দাম পাবে।

একটু তলিয়ে ভাবলেই কিন্তু একটা বড় বিপদের সন্ধান মিলবে। মেট্রোর এই বিশাল ক্রিয়াকলাপ চলতি সংগ্রহ-পরিবহন-প্রক্রিয়াকরণ-সরবরাহ শৃঙ্খলাটাকে দারুণ বিপদের সামনে ফেলে দেবে। এর সঙ্গে যুক্ত অসংখ্য খেটে-খাওয়া মানুষ কাজ হারাবে তা বলাই বাহুল্য। এখন যে পদ্ধতিতে পুরো প্রক্রিয়াটা চলে তা মূলত শ্রম-নির্ভর। অসংখ্য ছোট ব্যবসায়ী আর অসংগঠিত শ্রমিক বাহিনীর কাঁধে ভর করে পণ্য পৌঁছে যায় চাষের খেত কিংবা ছোট/মাঝারি কারখানার গেট থেকে খুচরো বিক্রেতা এমনকী, গৃহস্থের বাড়ির গেট পর্যন্ত! বলা বাহুল্য, এই ক্ষেত্রে বহুজাতিক বড় পুঁজির অনুপ্রবেশ ব্যাপক সংখ্যক মানুষকে জীবিকাচ্যুত করবে। তবে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হবে চলতি পাইকারি বাজারগুলির সঙ্গে যুক্ত অসংখ্য মানুষ।

বলা হচ্ছে, মেট্রো এলে নতুন কাজ মিলবে। অথচ হিসেব বলছে, এখানে সরাসরি কাজ পাবে ৩০০ জন; অবশ্য নিরাপত্তা, রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিবহনে আরও ৫০০জনের 'সহায়ক' কাজের সুযোগ হবে। অর্থাৎ, ৮০ কোটি ব্যয়ে চাকরি জুটবে ৮০০ জনের। সেই এক কোটি টাকা বিনিয়োগে মাত্র ১০ জন! এটাই তো স্বাভাবিক, পুঁজি-নিবিড়তা লক্ষ লক্ষ মানুষের ভাত মেরে নিজের কলেবর বড় করবে। তবে যারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কাজ পাবে তাদের মাইনে যে বাজার চলতি দরের থেকে অনেকটাই বেশি, তা সহজেই বোঝা যায়। তারই সঙ্গে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কিছু ভাগ্যবান উৎপাদকেরও লক্ষ্মীলাভ হবে তবে।

বহুজাতিকের সঙ্গে যুক্ত হতে গেলে যে ন্যূনতম যোগ্যতা দরকার তা লক্ষ লক্ষ মুটে, মজুর, ভ্যান-চালক, ঠেলাওয়ালা, খালাসি কিংবা ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষি এবং অসংগঠিত ক্ষেত্রের ক্ষুদ্র শিল্পোৎপাদকের কাছে আশাও করা যায় না। উল্টো দিকে, একেবারে ক্ষুদ্র খুচরো ব্যবসায়ীর নাগালের বাইরেই থেকে যাবে এই জমকালো পাইকারি বাজার। ফলে, একদিকে যেমন পরিবহন, বিপণন, সরবরাহ-ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত অসংখ্য মানুষের সমূহ বিপদ হতে পারে, অন্য দিকে আবার ক্ষুদ্র উৎপাদক এমনকী, ক্ষুদ্র খুচরো ব্যবসায়ীও এই পুরো প্রক্রিয়ার বাইরেই থেকে যাবে সম্পূর্ণ অবহেলায়। হয়তো, মেট্রোর মতো সংস্থার তৈরি করা বিস্তৃত সুসংগঠিত পুঁজি-নিবিড় তথাকথিত আধুনিক আন্তর্জাতিক মানের বিপণন শৃঙ্খলের পাশেই ধুঁকতে ধুঁকতে চলবে এখনকার অসংগঠিত শ্রমনিবিড় খুচরো ও পাইকারি ব্যবসার শৃঙ্খল। একই সঙ্গে চলবে দুটো অর্থ-ব্যবস্থা! কিন্তু কতদিন?

অসংগঠিত পাইকারি ও খুচরো ব্যবসার বিস্তৃত প্রক্রিয়াকে সুসংবদ্ধ করতে, শ্রমনিবিড় রেখেও এর সঙ্গে যুক্ত অসংখ্য খেটে খাওয়া মানুষের জীবনের মানোন্নয়ন করতে যে পরিকাঠামো তৈরি, প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তন (যেমন সমবায় তৈরি) এবং প্রযুক্তিগত উন্নতির দরকার ছিল তা রাজ্য সরকারের থেকে আশা করাও বাতুলতা। সরকারি মূল দলটির রাজ্য জোড়া আধিপত্য থাকা সত্ত্বেও এ-ব্যাপারে কোনও দিশা বা ভাবনা নেই। আদর্শগতভাবেও দলটি খুবই দুর্বল। অন্তত, সাধারণ মানুষের কাছে তেমন কোনও বার্তা তারা পৌঁছে দিতে অক্ষম। ছোট/মাঝারি পাইকারি ও খুচরো ব্যবসায়ী, ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষি আর অসংগঠিত ক্ষেত্রের ক্ষুদ্র শিল্পোৎপাদক—এই কয়েক কোটি মানুষকে সংগঠিত করার কাজ রাজ্য সরকারে আসীন মূল দলটির পক্ষে আর সম্ভব নয়। ক্ষুদ্র উৎপাদক, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী আর তাদের সঙ্গে যুক্ত করে রাজ্যের বিজ্ঞানী, প্রযুক্তিবিদ, অর্থনীতিবিদ, সমাজতাত্ত্বিকদের নিয়ে যে ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তোলা দরকার, তা রাজ্য সরকারের কাছ থেকে আশা করাও যেন পাপ!

আর সম্ভবত সে-কারণেই রাজ্য সরকার এক সম্পূর্ণ বিপরীত পদ্ধতি নিয়েছে। এই উল্টো পথের উপরি পাওনা নিশ্চয়ই দিশি বড় পুঁজি (যেমন রিলায়েন্স) আর বহুজাতিকের বদান্যতা। না হলে এই দু-দিন আগেই যোজনা কমিশনের সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করা পার্টিটি-ই কেন ডেকে আনবে বহুজাতিক সংস্থাকে। জনসভায় সোচ্চারে বলবে, এমনকী ওয়ালমার্টের মতো পৃথিবীর বৃহত্তম খুচরো ব্যবসা সংস্থাকে চাই (যদিও এ-নিয়ে বিতর্ক চরমে উঠেছে), পেপসিকে চাই। না হলে, কেনই বা ডেকে আনা হচ্ছে রিলায়েন্সকে রাজ্যের প্রতিটি মফস্বল শহরে তাদের খুচরো ব্যবসার শৃঙ্খলকে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য'!

লেখক বিশ্বভারতীর অর্থনীতির অধ্যাপক

28th.

পাড়ার মুদি বনাম 'মল', খুব কি আশার ছবি দেখা যাচ্ছে

সৌম্য চক্রবর্তী

পাইকারি কিংবা খুচরো বিপণন, পণ্য চলাচলের পুরো ব্যবস্থাটাতেই নিজেদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে কোমর বেঁধে নামছে দেশি-বিদেশি দৈত্যাকার সব কোম্পানি। যুক্তিটা এই, চলতি ব্যবস্থাটা অসংগঠিত, তাই একদিকে যেমন আড়তদার-ফোড়েদের দৌরাত্ম্য অন্যদিকে, আবার প্রচুর অপচয় হওয়ার আশঙ্কা। ঠিকমতো সংরক্ষণ, সময়মতো বিপণন না হওয়ায় মাছ, ফল, সব্জি এসবের অনেকটাই নষ্ট হয়। তার ওপর মধ্যস্বত্বভোগীদের অত্যাচারে ক্রেতা সাধারণ বেশি দাম দিতে বাধ্য হলেও তার খুব কম অংশই প্রকৃত উৎপাদকের হাতে পৌঁছয়। এটা কৃষি কিংবা শিল্প পণ্য সব ক্ষেত্রেই সত্য।

এসব সমস্যার কথা মাথায় থাকলে কয়েকটা নির্দিষ্ট সমাধান সূত্রই ভাবা উচিত। প্রথমত, আড়তদারদের এই পুরো বিনিময় (বিপণন) শৃঙ্খল থেকে বিচ্ছিন্ন করা দরকার'। খুচরো বিপণন, এমনকী পাইকারি ব্যবস্থাটাও এতটাই বিক্ষিপ্ত— অসংগঠিত যে আর্থিকভাবে একটু শক্তিশালী হলেই ছোট ছোট উৎপাদকের থেকে পণ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ, পরিবহন কিংবা খুচরো বিক্রেতাকে সরবরাহ এই প্রত্যেকটা ধাপেই অনেক দূর পর্যন্ত নিয়ন্ত্রণ কায়েম করা যায়। তাই প্রথম কাজই হল ক্ষুদ্র কৃষি কিংবা শিল্পোৎপাদক থেকে শুরু করে সংরক্ষণ, পরিবহন-এর সঙ্গে যুক্ত শ্রমিক এবং খুচরো দোকানদার এদের সবাইকে নিয়ে একটা সুসংবদ্ধ বিপণন শৃঙ্খল তৈরি করা। এটা করতে গেলে একদিকে যেমন সাংগঠনিক শক্তি দরকার, তেমনই চাই বিপণনের সব ক'টা ধাপকে যুক্ত করে সমবায়ের মতো প্রতিষ্ঠানের শৃঙ্খল তৈরি করার মানসিকতা—সাহস। এর সঙ্গে জুড়তে হবে আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলিকেও যাতে মহাজনরা মধ্যস্বত্বভোগী হয়ে উঠতে না পারে। তবে পুরো ব্যবস্থাটাই অচল হয়ে পড়বে যদি না যথেষ্ট পরিমাণে পরিকাঠামোগত (যেমন রাস্তাঘাট, সংরক্ষণ-পরিবহন ব্যবস্থা ইত্যাদি) এবং প্রযুক্তিগত সাহায্য মেলে। আর এখানেই সরকারেরও বড় ভূমিকা।

সরকারকেই দায়িত্ব নিয়ে এই বিশাল অসংগঠিত বিপণন শৃঙ্খলকে সুসংবদ্ধ করতে হবে। দরকার আঞ্চলিকভাবে ছোট উৎপাদক, সংরক্ষণ পরিবহনকর্মী আর খুচরো ব্যবসায়ীদের সংগঠিত করা। তার পর এই আঞ্চলিক সংগঠনগুলিকে যুক্ত করা এক রাজ্য-জোড়া শৃঙ্খলায়। তবে এই জোড়ার কাজটা তখনই সম্ভব যদি সংরক্ষণ ও পরিবহনের যথেষ্ট ব্যবস্থা থাকে। সঙ্গেই দরকার এমন প্রযুক্তি যা সস্তা অথচ কার্যকরি। এসব করলে পচনশীল পণ্যের অপচয়ও কমবে। কিন্তু এত কিছু করার জন্য চাই সঠিক দিশা আর সাংগঠনিক কাঠামো। রাজ্য সরকারের পক্ষে তা অসম্ভব। তাই ব্যবস্থার গলদগুলিকে মুছে ফেলে তার জোরের জায়গাটাকে বিকশিত করার বদলে সরকার একটা সর্বনাশা 'শর্টকাট' পথ নিয়েছে। প্রযুক্তি, পরিকাঠামো, সংগঠন সবই নাকি করে দেবে দৈত্যাকার কোম্পানিগুলি। ভাবখানা এমন, ছোট উৎপাদক, সরবরাহকর্মী, খুচরো ব্যবসায়ী, ক্রেতা সবারই নাকি এতে খুব লাভ। দুনিয়ার খেটে খাওয়া মানুষের জন্যই তো একচেটিয়া পুঁজি দরকার; পুঁজি এলেই নাকি সবার 'উন্নয়ন'।

একচেটিয়া পুঁজি অদক্ষ শ্রমকে প্রতিস্থাপিত করে, এ তো সবাই জানে। প্রথমত তার উৎপাদন প্রক্রিয়া যন্ত্র-নির্ভর। আর যতটুকুও বা শ্রম লাগে তা একেবারেই তথাকথিত উচ্চশিক্ষানির্ভর। সেখানে মুটে, মজুর, ছোট চাষি, অসংগঠিত ক্ষেত্রের শিল্পোৎপাদক কিংবা পাড়ার ছোট দোকানি এরা ব্রাত্য। খুব বেশি হলে কিছু দক্ষ শ্রমিকের কাজ জুটতে পারে। কিন্তু পুরো বিপণন শৃঙ্খলে একচেটিয়া আধিপত্য প্রতিষ্ঠা হলে যে বিরাট অংশের মানুষ কাজ হারাবে তা বুঝতে অসুবিধা হয় না।

প্রাথমিকভাবে ধাক্কা খাবে সেই সব ছোট পাইকারি আর খুচরো বিক্রেতা যারা মূলত বড় শহর আর মফস্বলে জিনিসপত্র সরবরাহ করে। কারণ, একদিকে যেমন বহুজাতিক কলকাতার পাইকারি বাজারগুলিকে (যেমন শিয়ালদহ, বড়বাজার, বেহালা) বড় ধাক্কা দেবে, অন্যদিকে আবার আর এক বিশাল সংস্থা রাজ্যের প্রায় সমস্ত মফস্বল শহরে খুচরো বিপণনকেন্দ্র খুলতে চলেছে, সেখানে ' ছোট ব্যবসায়ীরা কঠিন সমস্যায় পড়বে। আর এর সঙ্গেই কাজ হারাবে অদক্ষ সংরক্ষণ ও পরিবহনকর্মীরা। কারণ, ওই বিরাট কোম্পানিগুলি শুধু পাইকারি ও খুচরো বিপণনই নয়, পণ্য সংগ্রহ সংরক্ষণ প্রক্রিয়াকরণ - পরিবহন ও সরবরাহ এই পুরো প্রক্রিয়াটিকেই তাদের মুনাফা লোটার জায়গা হিসেবে বেছে নিচ্ছে। অদক্ষ শ্রমিকদের সেখানে খুব একটা জায়গা নেই। যন্ত্র-নির্ভর পদ্ধতিতে কিছু দক্ষ শ্রমিকের হিল্লে হতে পারে।

মধ্যবিত্ত ক্রেতাকে 'শপিং মল'-এর স্বপ্ন দেখানো হচ্ছে ঠিকই, কিন্তু ধাক্কাটা তাকেও সহ্য করতে হবে। তাজা ফল-মাছ-সবজি এখন যতটুকুও বা পাওয়া যায় 'মল'-এর ধাক্কায় পাড়ার বাজার থেকে সেসব অনেকটাই উধাও হয়ে যাবে। মধ্যবিত্তকে হয় বেশি দাম দিয়ে তা ওসব মল থেকে কিনতে হবে, নয়তো বা নিম্নবিত্তের জন্য পড়ে থাকা বাজারে ভাগ বসাতে হবে। সেটা মধ্য বা নিম্নবিত্ত কারোর পক্ষেই সুখকর হবে না। উচ্চবিত্তের 'রিটেল চেন' আর মধ্য ও নিম্নবিত্তের ঘিঞ্জি ফুটপাথের বাজার—এ দু'য়ের দ্বন্দ্ব অনিবার্য।

অন্য একটা গল্পও শোনানো হচ্ছে। বিপণনে অতিকায় পুঁজি লগ্নি করলে নাকি ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষি আর ছোট শিল্পোৎপাদক ঠিকমতো দাম পাবে। কারণ, এভাবে আড়তদারদের আধিপত্য কমবে। এর চেয়ে বড় মিথ্যাচার আর হয় না! যদি ধরেও নিই যে ফোড়েদের দৌরাত্ম্য কমবে, তার জায়গা নেবে একচেটিয়া পুঁজি, একচেটিয়া দৈত্যাকার পুঁজি ক্ষুদ্র উৎপাদককে ন্যায্য দাম দেবে, তা অর্থনীতির কোন বইয়ে, কোন তত্ত্বে লেখা আছে জানতে পারলে বড্ড ভাল হত! সম্ভবত মধ্যস্বত্বভোগীদের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধেই চলবে অবাধ শোষণ।

একদিকে রয়েছে উচ্চবিত্ত আর উচ্চ-মধ্যবিত্তের জন্য তাজা ফল-সবজি-মাছ আর হরেক রকম শিল্পপণ্যের সমাহার। তার সঙ্গেই তথাকথিত উচ্চশিক্ষিতদের কিছু কাজের সুযোগ (আজকাল খবরের কাগজে চোখ রাখলেই রিটেল চেন-এ মোটা মাইনের চাকরির গল্প পাওয়া যাচ্ছে)। দেশি-বিদেশি বৃহৎ পুঁজির জন্য ঢেলে সাজানো হচ্ছে পরিকাঠামো—অনেকটাই করদাতার পয়সায়। অথচ ক'দিন আগেই সংবাদ প্রতিদিন পত্রিকার এই কলমই দেখলাম তুলনামূলকভাবে অনেক ছোট ফল-ফুল-সবজি উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ ও বিপণন সংস্থার বাঙালি কর্ণধারকে আফসোস করে লিখতে, সরকার যেন তাঁদের ব্যাপারে যথেষ্ট মনোযোগী নয়। হায় উন্নয়ন!

(লেখক বিশ্বভারতীর অর্থনীতির অধ্যাপক)

খাদ্যপণ্যের বাজারে বড় পুঁজির অনুপ্রবেশ দুশ্চিন্তার কারণ

সৌম্য চক্রবর্তী

কয়েকটা টুকরো ছবি, আলাদাভাবে দেখলে মনে হতেই পারে, বেশ তো 'উন্নয়ন' হচ্ছে। বড় পুঁজির বিনিয়োগের হাত ধরে টাট্‌কা ফল-মাছ-সবজির বাজারটা যেন চারপাশে ছড়িয়ে পড়ছে। এতে নাকি চাষি, পাইকারি কিংবা খুচরো বিক্রেতা, সাধারণ ক্রেতা— সবারই লাভ। কর্মসংস্থানেরও নাকি অনেক সুযোগ তৈরি হবে। তা, ছবিগুলি পরপর সাজিয়ে একটু দেখে নেওয়া যাক। টুকরোগুলি জুড়লে যে সামগ্রিক ছবিটা পাওয়া যাচ্ছে তাতে দুশ্চিন্তার যথেষ্ট কারণ আছে।

১. দৈত্যাকার সব কোম্পানি হাজার হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ করে পাইকারি কিংবা খুচরো বাজারে ব্যবসা করতে নামছে। প্রশ্ন হল, এরা ফল-মাছ-সবজি সংগ্রহ করবে কীভাবে? তার উত্তরও আছে, তৈরি হবে 'রুরাল বিজনেস হাব' বা গ্রামীণ ব্যবসাকেন্দ্র। এই কেন্দ্রগুলি শুধু খাদ্যবস্তু সংগ্রহই করবে না, কৃষকের চাষে সাহায্যও করবে। বীজ, সার, প্রযুক্তিগত সহায়তা, এইসব আর কী। কোন চাষ কতটা, এমনকী কোন রঙের ফুল-ফল-সবজি তাদের চাই, এসবও নাকি ঠিক করে দেবে কোম্পানিগুলি।

বলাবাহুল্য, তারা ব্যবসা করতে আসছে, তাই বাজারের চাহিদামতো পণ্যই তাদের দরকার। তার জন্য যদি বকলমে চুক্তিচাষ চলে ক্ষতি কী! সমস্যা একটাই, দৈত্যাকার কোম্পানির সঙ্গে ফোড়ে মারফত অসংখ্য ছোট চাষির চুক্তির ফলটা কিন্তু বিপজ্জনক হতে পারে!

২. গ্রামীণ কেন্দ্রে পণ্য জড়ো হলে, তা পৌঁছে দেওয়া হবে জেলার মূল বণ্টন কেন্দ্রে। জেলায় জেলায় এমন বণ্টনকেন্দ্র থাকবে। সঙ্গে থাকবে সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ ইত্যাদির ব্যবস্থা। এর পর প্যাকেটে ভরা কৃষিপণ্য পৌঁছে যাবে বড় /মাঝারি শহরের আধুনিক খুচরো বিক্রয়কেন্দ্রগুলিতে। এই পুরো প্রক্রিয়ায় চলতি সংগ্রহ-সংরক্ষণ-পরিবহন-প্রক্রিয়াকরণ-সরবরাহ ব্যবস্থাটা যে ধাক্কা খাবে, বলাই বাহুল্য। বহু ছোট ব্যবসায়ী, পরিবহন-কর্মী, 'মুটে-মজুর' কাজ হারাবে। কিঁন্তু এখানেই শেষ নয়।

৩. কলকাতাকে ঘিরে তিনটে বিরাট ফল সবজি-মাছ-মাংসের বাজার তৈরির পরিকল্পনা করেছে রাজ্যের খাদ্য দফতর। সেগুলি বেসরকারি সংস্থার সঙ্গে যৌথভাবে হওয়ার কথা। অবশ্য বেসরকারি সংস্থার স্বাধীনতা থাকবে তাদের পছন্দমতো ব্যবসা করার। এই বাজারগুলিতে আধুনিক যোগাযোগের সুবিধা, পণ্য-নিলামের বৈদ্যুতিন ব্যবস্থা, পণ্য বিনিময়ের উপযোগী ব্যাঙ্কিং সহায়তা, প্রক্রিয়াকরণ ও সংরক্ষণের বিপুল সরঞ্জাম হাজির থাকবে। সঙ্গে এমনকী, কৃষি উৎপাদনের নানারকম উপকরণও থাকার কথা। বোঝাই যাচ্ছে, এই বাজারগুলির মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ কাঁচামাল ও খাদ্যপণ্যের ব্যবসা হবে। প্রশ্ন হল, এই বাজারে ফল-মাছ সবজি আসবে কীভাবে?

৪. প্রতিটি বাজারের সঙ্গে যুক্ত থাকবে অসংখ্য সংগ্রহকেন্দ্র, যেগুলি অতি গুরুত্বপূর্ণ কৃষি উৎপাদন অঞ্চলে গড়ে তোলা হবে। কৃষিপণ্য সরাসরি কৃষকদের থেকে কেনার পর ওইসব কেন্দ্রে ঝাড়াই বাছাই হয়ে চলে আসবে বারুইপুর, বারাসত আর ডানকুনির প্রস্তাবিত তিনটি 'প্রান্তিক' বাজারে। এর জন্য প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো কিংবা যোগাযোগ-ব্যবস্থা তৈরির ব্যয়ভার অনেকটাই বহন করবে সরকার; বেসরকারি সংস্থা সেসব সুযোগ-সুবিধে ব্যবহার করে ব্যবসা করবে। এই পদ্ধতিতে উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, হাওড়া ও হুগলির বিস্তীর্ণ কৃষি অঞ্চল থেকে তারা পণ্য সংগ্রহ করতে পারবে। অনেক ক্ষেত্রে এই পরিকাঠমো ব্যবহার করেই কৃষির জন্য দরকারি কাঁচামাল, এমনকী সাধারণের ভোগ্যপণ্যও পৌঁছে যাবে প্রত্যন্ত অঞ্চলে। দ্বিমুখী পণ্য বিনিময়েরই সুযোগ পাবে বেসরকারি সংস্থাগুলি। একদিকে কৃষিপণ্য গ্রাম থেকে নিয়ে আসা, অন্যদিকে আধুনিক শিল্পপণ্যের গ্রামীণ বাজারে ছড়িয়ে পড়া — দুই-ই হবে এ পথে।

৫. এইরকমই একটা 'প্রান্তিক' বাজার ও তার সঙ্গে যুক্ত সংগ্রহ কেন্দ্রগুলির শৃঙ্খল-এর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে একটি বড় সংস্থাকে। তারাই সরকারের সঙ্গে একযোগে তৈরি করছে পরিকাঠামোর শৃঙ্খল। কারা ব্যবহার করবে সেই সুযোগ?

খবরে প্রকাশ, বিশাল বিশাল কয়েকটি সংস্থা। এই বিশাল সংস্থাগুলিই তাদের খামার থেকে খুচরো ব্যবসার পুরো প্রক্রিয়াটা চালাবে এই বিস্তৃত পরিকাঠামোর সাহায্যে। প্রতিদিন নাকি ৫৫০ টন কৃষিপণ্য চলাচল করবে এই শৃঙ্খল মারফত। বলা হচ্ছে, এই প্রক্রিয়ায় চাষি ফসলের ঠিকঠাক দাম পাবে কিংবা ক্রেতা মাছ-ফল-সবজি পাবে, যথেষ্ট সস্তায়। এটা সত্যি হলে, তার সঙ্গে এটাও বলা দরকার, বৃহৎ পুঁজির একচেটিয়া ব্যবসার ফলাফল সংক্রান্ত যে তত্ত্ব আমরা পড়ি বা পড়াই তাতে নিশ্চয়ই বড়রকমের গলদ আছে! তাই, যদি মেনে নিই, একচেটিয়া পুঁজি সাধারণের থেকেও বেশি শোষণ চালায়, তবে এদের ডেকে আনার উদ্দেশ্য নিয়ে সন্দেহ তৈরি হতে বাধ্য। বিশেষত, যখন ইতিমধ্যেই বড় পুঁজি ও সরকারি সহায়তা ছাড়াই পণ্য চলাচলের বিপুল শৃঙ্খল তৈরি হয়ে গিয়েছে — সমাজের চাহিদা মেনেই।

৬. কলকাতা কি বড় পুঁজির দখলে চলে আসা বিশাল পণ্য ব্যবসার একমাত্র গন্তব্য? অবশ্যই কলকাতার (এমনকী বর্ধমান, শিলিগুড়ি কিংবা মালদহের মতো শহরের) শপিং মলগুলিতে পাওয়া যাবে টাটকা ফল-সবজি-মাছ-মাংস। কলকাতার উচ্চবিত্ত-উচ্চমধ্যবিত্তের জন্য হাওড়া-হুগলি- ২৪ পরগনার চাষিদের দিয়ে তৈরি করিয়ে নেওয়া হবে রং-বেরঙের নামী-দামি ফল-ফুল-সবজি; সঙ্গে আসবে বাঙালির প্রিয় মাছ, এমনকী মাংস। কিন্তু সবটাই কলকাতার (কিংবা অন্যান্য শহরের) উচ্চ শ্রেণির ভোগের জন্য নয়।

ইদানীং কলকাতার উপকণ্ঠে আর একটা এয়ারপোর্ট তৈরির কথা শোনা যাচ্ছে। মূলত, মালপত্র পরিবহনের জন্যই তা লাগবে। দ্রুততম পরিবহনের মাধ্যমে ফল-ফুল-সবজি-মাছ-মাংস পৌঁছে যাবে বিদেশে, যেখানে উচ্চশ্রেণির মধ্যে সে-সবের চাহিদা আছে। অর্থাৎ, মূলত সরকারি সহায়তায় গড়ে তোলা পরিকাঠামো ব্যবহার করে বড় পুঁজির প্রতিষ্ঠানগুলি দেশি-বিদেশি উচ্চ শ্রেণির মানুষের চাহিদা মেটাবে— নিজেরা ব্যবসা করবে। আমাদের ছোট চাষিকে দিয়ে তৈরি করিয়ে নেবে তাদের হিসাব মতো পণ্য। তাই, চলতি পাইকারি বা খুচরো ব্যবসায় বিপজ্জনক প্রভাব ছাড়াও সার্বিক, বিশেষত, ব্যক্তিগত স্তরে খাদ্য-নিরাপত্তার প্রশ্নটাও উঠে পড়াই স্বাভাবিক।

(লেখক বিশ্বভারতীর অর্থনীতির অধ্যাপক)

খাদ্যপণ্যের বিশ্বায়িত বাজার বনাম আমাদের খাদ্য নিরাপত্তা

সৌম্য চক্রবর্তী

খাদ্যপণ্যের বিস্তৃত বাজারটাকে 'সংগঠিত' করার জন্যই নাকি রাজ্যে দেশি-বিদেশি বড় পুঁজিপতিদের ডেকে আনা হচ্ছে। খেত-খামার থেকে কৃষিপণ্য সংগ্রহ, তার পর তো ঝাড়াই বাছাই, প্রক্রিয়াকরণ, 'প্যাকেজিং' করে বড় শহর ও মফস্বলের পাইকারি বা খুচরো বাজারে বিক্রি। এই পুরো প্রক্রিয়াটাকেই সুসংবদ্ধ ও 'আধুনিক' করা দরকার। তাই চাই বড় বড় বিনিয়োগ। এমনটাই রাজ্যের কর্মকর্তাদের দাবি।

কিন্তু 'শপিং-মল' /'ফুড-বাজার' -এ উচ্চবিত্ত, উচ্চ-মধ্যবিত্তের জন্য টাটকা ফল-ফুল-সবজি-মাছ-মাংস পৌঁছে দেওয়া ছাড়াও এর আর একটা উদ্দেশ্য স্পষ্ট করে বলা হচ্ছে না। তবে, বিচ্ছিন্ন দু'একটা খবরকে মেলালে পুরো ছবিটা পেতে অসুবিধা হয় না।

এমনভাবে পরিকাঠামো সাজানো হচ্ছে যাতে কলকাতা শহরে বিপুল পরিমাণ খাদ্যপণ্য নিরবচ্ছিন্নভাবে আনা যেতে পারে। চারপাশের উচ্চ ফলনশীল জেলাগুলি থেকে প্রতিদিন ঠিকঠাক পৌঁছে যাবে টাটকা ফসল। এর পুরোটাই কলকাতার জন্য, তা ভাবলে ভুল হবে। সম্ভবত, এই জোগানের সবচেয়ে বড় লক্ষ্য প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বের বাজার, কলকাতার মতোই সেখানকার উচ্চ শ্রেণির মধ্যেও এসবের যথেষ্ট চাহিদা আছে। তাই কলকাতার কাছেই নতুন এয়ারপোর্ট তৈরির কথা নাকি হচ্ছে যার একটা মূল কাজ হবে পচনশীল পণ্যের দ্রুত পরিবহন।

কিন্তু এসব কোনও বিচ্ছিন্ন ষড়যন্ত্র নয়। বিশ্বায়নের নিয়ম মেনেই তা হচ্ছে। প্রাকৃতিক কারণেই আমাদের রাজ্য তথা দেশ ফল-ফুল-সবজির বিপুল ভাণ্ডার হতে পারে, যে-সুযোগ অনেক 'উন্নত' দেশেই নেই। তাই এখানে তুলনামূলকভাবে সহজে- সস্তায় ফলানো রং-বেরঙের কৃষিপণ্য দেশের সঙ্গে বিদেশের বাজারেও চড়া দামে বিক্রি করতে পারলে প্রচুর মুনাফা করা যাবে। এটাই বড় পুঁজির আকর্ষণের মূল কারণ। বিশ্বায়িত খাদ্য-বাজারে ব্যবসা করার লোভ, বিপুল মুনাফার হাতছানি, এসব কি বড় পুঁজি হাতছাড়া করতে পারে! পুঁজির ধর্মই তো ক্রমাগত মুনাফার খোঁজ— ব্যবসা বাড়ানোর চেষ্টা।

কিন্তু ভাবখানা এমন, বড় (কর্পোরেট) পুঁজিরও একটা সামাজিক দায়িত্ব আছে, তাই যেন তাদের এ-রাজ্যে ডেকে আনা হচ্ছে। আড়তদার/ ফোড়েদের দৌরাত্ম্যে চাষি ফসলের ঠিকমতো দাম না পেলেও ক্রেতাকে তা বেশি দামে কিনতে হয়; অন্যদিকে, প্রযুক্তির অভাবে বিপুল পরিমাণ কৃষিপণ্য নষ্ট হয়। এসব সামলাতেই নাকি বড় বিনিয়োগ দরকার। প্রশ্নটা এখানেই, পুঁজি তো তার নিয়মেই চলবে, কিন্তু 'বামপন্থী' সরকার কেন আমাদের ভুল বোঝানোর চেষ্টা করবে? মাত্র কয়েকটা দৈত্যাকার সংস্থা খাদ্যপণ্যের বাজারে আধিপত্য বিস্তার করতে পারলে চাষি বা সাধারণ ক্রেতা কেউই পার পাবে না। এটা তো অর্থনীতির স্নাতক স্তরের ছাত্রই বুঝিয়ে দিতে পারে। এও বোঝা সহজ, খাদ্যপণ্য চলাচলের সঙ্গে যুক্ত অসংখ্য মানুষের কর্মচ্যুতি ঘটবে।

তবে অন্য একটা বড় ভয়ও আছে। বিশ্ববাজারে

মুনাফার সুযোগ, তাই বড় সংস্থাগুলি চাষিদের দিয়ে অর্থকরী ফসল চাষ করিয়ে নিতে চাইবে। এমনকী, সাময়িক ভাল দামের আকর্ষণে কোণঠাসা ছোট চাষিও প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষে কর্পোরেটের সঙ্গে চুক্তিতে চাষ মেনে নিতে পারে। সেক্ষেত্রে নিজের খাদ্যের জোগানটা আর তার হাতে থাকবে না। এমনটা রাজ্য জুড়ে হতে থাকলে সামগ্রিক খাদ্যভাণ্ডারেও টান পড়বে। উল্টো যুক্তি আসতে পারে, এতে ক্ষতি কী, আমরা সবজি-ফল বানিয়ে পয়সা পাব তা দিয়ে অন্য রাজ্য থেকে চাল কিনব। এটা তো একজন চাষির ক্ষেত্রেও খাটে। বড় সংস্থাকে ফুল-মাছ বেচে যে আয় হবে তা দিয়ে বাজার থেকে চাল-ডাল-তেল কিনে নিলেই হল। কিন্তু বাজারে যে সব সময় চাল-ডাল পাব, তার গ্যারান্টি আছে তো? সবচেয়ে বড় কথা— তা ধরাছোঁয়ার মধ্যে থাকবে তো!

প্রথমত, বুঝে নেওয়া দরকার, ফল-ফুল-সবজি-মাছ-মাংস তাড়াতাড়ি বেচতেই হবে, দু-একদিনের বেশি তা টিকবে না। তাই খাদ্য-নিরাপত্তা আর হাতের মধ্যে রইল না। বড় কোম্পানি ঠিক সময়ে ঠিকঠাক দামে এসব কিনলে তবেই আয় হবে, তবেই খাবার কেনা যাবে। কে বলে দিল এসব 'গ্যারান্টি'?

দ্বিতীয়ত, সবাই ধান-গম-ডাল- তিল চাষ থেকে সরে গেলে (চুক্তি চাষের ধাক্কায়/ আকর্ষণে) ও সব আনতে হবে বাইরে থেকে, আঞ্চলিকভাবে মিলবে না। অঞ্চল বা রাজ্যের বাইরে যে পাওয়াই যাবে তার নিশ্চয়তা কী? লাভের আশায় আমরা যদি ফল-ফুল চাষে ব্যস্ত হই, অন্য রাজ্যের সরকার/চাষি বসে বসে তা দেখবে এমন ভাবার কি কোনও কারণ আছে? সারা দেশেই চলবে/ চলছে এই 'শস্যের বৈচিত্রায়ন'। তাই রাজ্যে খাদ্য ঘাটতি হলে অমনি অন্য রাজ্য থেকে তা পেয়ে যাব এই ভুল ধারণা একপেশে অর্থনীতি চিন্তার ফল।

একইরকম ভ্রান্ত যুক্তির উপর দাঁড়িয়ে এমনকী এও বলা হচ্ছে, বিশ্বায়িত মুক্ত বাজারে দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিয়ে মাথা ঘামানোর দরকার নেই। ভারত ফল-ফুল-সবজি-মাছ-মাংস বেচবে, তার বদলে শস্য কিনে নেবে খোলা বাজারে। কিন্তু এটা বহু চর্চিত বিষয়, দেশের খাদ্য নিরাপত্তা এমনকী, সামরিক নিরাপত্তার থেকেও বেশি জরুরি, তাকে বাজারের হাতে ছেড়ে দেওয়া যায় না। এইসব যুক্তি-তর্ককে পাত্তা না দিয়ে এক ধাক্কায় ডেকে আনা হচ্ছে দেশি-বিদেশি বড় পুঁজিকে।

অন্য দিকে, রাজ্যের এই ছবিটার সঙ্গে অদ্ভুত মিল লালুপ্রসাদের রেল পরিকল্পনার। ভারতীয় রেলের ৭৫ হাজার স্টেশনে নাকি সবজি কাউন্টার হবে। সেখানে চাষিরা ফসল বেচতে পারবে। ফসলের সংরক্ষণ এমনকী, প্যাকেজিংয়ের দায়িত্বও রেলের। কিন্তু এই ফসল কিনে, সংরক্ষণ করে রেল কী করবে? আসলে, যারা কৃষিপণ্যের ব্যবসা করতে আসছে, বড় বড় দেশি-বিদেশি কোম্পানি— তারা কিনে নিতে পারবে এই সবজি/ ফল। ভাড়ার বিনিময়ে রেল মারফতই সে সবের পরিবহন হবে। এতে রেলের নাকি বিরাট লাভ।

এই কাউন্টারগুলিতে পাওয়া যাবে উন্নত বীজ, সার। তা ছাড়া, কী চাষ— কেমনভাবে, সে-বিষয়েও পরামর্শ মিলবে। তাই চাইলে চাষিকে দিয়ে বাজার অনুযায়ী ফসলও ফলিয়ে নেওয়া যেতে পারে। এটা তো বকলমে চুক্তি চাষের সুযোগ!

আর সবচেয়ে যেটা অভিনব, এই সব কাউন্টার থেকে সবজি কিংবা ফল যদি কেউ দেশের বন্দরগুলিতে নিয়ে যেতে চায় বিদেশে রফতানির উদ্দেশ্যে, তবে তা শুধু স্বাগতই নয়, সেক্ষেত্রে পণ্য মাসুল কম লাগবে। চমৎকার! ব্রিটিশ আমলে রেলের পণ্য মাসুলে ঠিক এমনটাই ছাড় মিলত। ইংল্যান্ডের শিল্পের প্রয়োজনে কাঁচামাল আমাদের দেশের অভ্যন্তর থেকে বন্দরে নিয়ে গেলে ভাড়া কম, অথচ উল্টোটায় ভাড়া বেশি! সে-তো করা হয়েছিল ইংরেজ 'প্রভু'দের জন্য। কিন্তু আজ? কাদের জন্য এই বিপুল শস্য বৈচিত্রায়ন, কেন কলকাতার কিংবা বিদেশের খাদ্য-পণ্যের বাজার ধরার জন্য ডেকে আনা হচ্ছে দেশি-বিদেশি বহুজাতিকদের! আমাদের কিন্তু ইতিহাস থেকে শিক্ষা নেওয়া উচিত।

(লেখক বিশ্বভারতীর অর্থনীতির অধ্যাপক)

া থেকে প্রকাশিত । **কলকাতা** : প্রতিদিন প্রকাশনী লিমিটেডের পক্ষে **সৃঞ্জয় বোস** কর্তৃক বি এল পাব্লিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ২০ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭২ থেকে মু
কর্তৃক দর্পণ পাব্লিকেশনস প্রাঃ লিঃ, ৩ মাইল, সেবক রোড, শিলিগুড়ি ৭৩৪০০৮ থেকে মুদ্রিত ও সিটি প্লাজা কমপ্লেক্স, ৩য় তল, সেবক রোড, শিলিগুড়ি ৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত। ফোন
.ডের পক্ষে **সৃঞ্জয় বোস** কর্তৃক প্রত্যহ নিউজ সার্ভিস প্রাইভেট লিমিটেড, ভিলেজ : ঘুটগড়িয়া, পোঃ অঃ : বড়জোড়া, মৌজা : কাদাশোল, জেলা : বাঁকুড়া থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ফোন
email : pratidin @cal2.vsnl.net.in Regd. No. WBBEN 53080/92, Post Regd. No. WB/CC 635
imultaneously from Kolkata, Siliguri & Barjora. **Kolkata :** Printed & Published by **Srinjoy Bose** on behalf of Pratidin Prakashani Ltd. 20, Prafulla Sarkar Street, Kolka
ı : **Siliguri** : Printed by **Srinjoy Bose** on behalf of Pratidin Prakashani Ltd. at Darpan Publications Pvt. Ltd, 3rd mile, Sevak Road, Siliguri-734008 & Published by him
lished by **Srinjoy Bose** on behalf of Pratidin Prakashani Ltd. at Pratyaha News Service Pvt. Ltd., Vill. : Ghutgaria, P.O. : Barjora, Mouza : Kadashole, Dist. : Bankura.
e.mail pratidin @cal2.vsnl.net.in Regd. No. WBBEN 53080/92, Post Regd. No. WB/CC 635

গ্রামীণ বিশিল্পায়নেই আধুনিক শিল্পের বাজার তৈরি হয়

সৌম্য চক্রবর্তী

রাজ্যে শিল্পায়নের পক্ষে সওয়াল করতে গিয়ে গ্রাম কিংবা মফস্বলের চাওয়া-পাওয়াগুলোকে বারবার সামনে নিয়ে আসা হচ্ছে। বলা হচ্ছে, রাজ্যের গ্রামাঞ্চলে শিল্প পণ্য ও পরিষেবার বিরাট বাজার তৈরি হয়েছে। আর এই চাহিদাই শিল্পপতিদের আকর্ষণের অন্যতম প্রধান কারণ। অন্যদিকে, গ্রাম-মফস্বলের এই বিস্তৃত বাজারে 'আধুনিক' পণ্য - পরিষেবা পৌঁছলে ক্রেতাসাধারণ লাভবান হবেন। তাই পশ্চিমবঙ্গে শিল্পায়ন দরকার।

ভোক্তার পরিতৃপ্তি তো এখন রাজ্য সরকারের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু প্রশ্ন হল, কোন ভোক্তার সন্তুষ্টি? সমস্ত ভোক্তা কি একটাই শ্রেণিভুক্ত? তা ছাড়া, এই শিল্পায়ন প্রক্রিয়ায় কি এক শ্রেণির ভোক্তার পরিতৃপ্তির সঙ্গে অন্য এক শ্রেণির উৎপাদকের স্বার্থের সঙ্ঘাত হতে পারে? এসব প্রশ্ন ভেবে দেখা দরকার।

প্রথমত, এই যে বলা হচ্ছে, রাজ্যের গ্রামাঞ্চলে বিরাট বাজার তৈরি হয়েছে, তা কতদূর সত্যি। সরকারি রিপোর্টে (NSSO, 2004-05) দেখেছি, এমনকী খাদ্য-নিরাপত্তার নিরিখেও আমরা দেশের অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় অনেক পিছিয়ে আছি। সারা বছর কয়েক মাস দু'বেলা পেট ভরে খেতে পায় না, এ-রাজ্যেও এমন পরিবারের সংখ্যা প্রতি হাজারে ১০৬! যদি ধরেও নিই, আমাদের গ্রাম ও মফস্বলে পণ্যের মোট চাহিদা বেড়েছে, তবু এই হিসাব থেকেই এটা স্পষ্ট সবার ক্ষেত্রে তা মোটেই সত্যি নয়। ১২ লক্ষ পরিবারের সম্বৎসর দু'বেলা পেট ভরা খাবার জোটে না, তারা আধুনিক পণ্য কিনবে কীভাবে? আসলে সবার ক্রয়ক্ষমতা মোটেই বাড়েনি।

এখন প্রশ্ন হল, যাও-বা বেড়েছে, তা এল কোথা থেকে? গত আট-ন'য়ের দশকে পশ্চিমবঙ্গের কৃষিতে বেশ কিছু পরিবর্তন এসেছে। উৎপাদন বৃদ্ধির কারণে সম্পন্ন চাষির হাতে নিজের পরিবারের প্রয়োজনের ফসলটুকুর উপরেও বাড়তি কিছু থাকছে। সেই উদ্বৃত্ত কৃষিপণ্য বিক্রি করতে পারলে তবেই জোটে বাড়তি আয়। যেসব কৃষক পরিবার নিজের খাদ্যশস্য নিজেই তৈরি করে নিতে পারে তারা নিশ্চয়ই এই বাড়তি

ফসল কিনবে না। অর্থাৎ, উদ্বৃত্ত ফসল তৈরি করা পরিবারগুলোকে পণ্য বেচতে হবে অকৃষি ক্ষেত্রে যুক্ত মানুষদের। অন্যভাবে বললে, অকৃষি ক্ষেত্রে কর্মরতদের হাতে যথেষ্ট আয় থাকতে হবে, যাতে তারা উদ্বৃত্ত শস্য কিনতে পারে।

অকৃষি ক্ষেত্রের (যেমন শিল্প পরিষেবা) যথেষ্ট-প্রসার ঘটলে, তবেই সেখানে আয় বাড়ে। ফলে তৈরি হয় ফসলের চাহিদা। এতে চাষিরও লাভ। শুধু কৃষি পণ্যের এক তরফা উৎপাদন বৃদ্ধি হলেই কৃষকের আয় বাড়ে না। কৃষির সঙ্গে অকৃষিকেও সমানতালে বাড়তে হয়, তবেই কৃষির আয় বেড়ে পণ্যের বাজার তৈরি হয়।

আমাদের ফসল রাজ্যের বাইরে বিক্রি হয় ঠিকই, কিন্তু সেটা একটা ছোট অংশ। বেশিরভাগটাই কেনে রাজ্যের অকৃষি ক্ষেত্রে যুক্ত ভোক্তারা। এটাই প্রমাণ করে, রাজ্যে একটা বড় অকৃষি ক্ষেত্র কাজ করছে যার খবর আমরা তেমন একটা রাখি না। না হলে চাষির হাতে টাকা এল কোথা থেকে, কোথা থেকেই-বা (আধুনিক) পণ্য-পরিষেবার বাজার তৈরি হল?

শহরে বড় শিল্প নেই ঠিকই, কিন্তু এ-রাজ্যেরই গ্রামে আর মফস্বলে একটা বড় অকৃষি ক্ষেত্র গড়ে উঠেছে— গ্রামীণ শিল্প তার মধ্যে প্রধান। এভাবে গ্রামীণ অকৃষি আয় বাড়ায় ফসলের চাহিদা তৈরি হচ্ছে। চাষির হাতে কিছু বাড়তি টাকা আসছে। এটাই নাকি শিল্পায়নের একটা ভিত্তি। প্রশ্ন হল, চাষি কি এই আয় জমিয়ে রাখছে? নিশ্চয়ই নয়। এই টাকা দিয়েই কিনছে শিল্পপণ্য ও পরিষেবা— যা এই রাজ্যের গ্রামাঞ্চলের অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানে তৈরি হয়, এই রাজ্যের লক্ষ লক্ষ স্বনিযুক্ত স্ব-উদ্যোগী মানুষ যে পরিষেবা সরবরাহ করে থাকেন।

এভাবেই কৃষি ও অকৃষি দুইয়ে মিলে একটা মিথস্ক্রিয়া চলে। দুটো ক্ষেত্রই তিলে তিলে বেড়ে উঠেছে নিজস্ব শক্তিতে, বাইরে থেকে তেমন কোনও সাহায্য ছাড়াই। কৃষি অকৃষি ক্ষেত্রকে জোগাচ্ছে উদ্বৃত্ত ফসল ও বাজার। উল্টোদিকে, অকৃষি ক্ষেত্র কৃষককে সাহায্য করছে ফসলের বাজার তৈরি আর শিল্পপণ্য ও পরিষেবার জোগান দিয়ে।

যদি 'আধুনিক' শিল্প তার পণ্য ও পরিষেবা নিয়ে মফস্বল ও গ্রামের বাজার ধরতে উঠেপড়ে লাগে, তবে যা ঘটবে তা 'বিশিল্পায়ন' ছাড়া কিছুই নয়। 'আধুনিক' পণ্যের ধাক্কায় গ্রামীণ অকৃষিক্ষেত্র চরম বিপদের সম্মুখীন হবে। শিল্পের বাজার আছে, এটা বলে বড় কোম্পানিগুলোকে ডেকে আনা মানে গ্রামীণ অকৃষিকে প্রতিস্থাপিত করা— অসংখ্য মানুষকে জীবিকাচ্যুত করা। 'আধুনিক' পণ্য এলে ভোক্তার পরিতৃপ্তি, কিন্তু লক্ষ লক্ষ ক্ষুদ্র উৎপাদকের সর্বনাশ। আশা করি, 'সরকারি' তাত্ত্বিকরা এসব ভেবে দেখবেন।

(লেখক বিশ্বভারতীর অর্থনীতির অধ্যাপক)

অর্থনীতি

এই শিল্পায়নে কি সত্যিই সবার উন্নতি হবে

সৌম্য চক্রবর্তী

রাজ্যের চলতি শিল্পায়ন প্রক্রিয়ার সমর্থনে যুক্তি দাঁড় করাতে অনেক সময়ই সমাজতান্ত্রিক শিল্পায়নের উদাহরণ টানা হচ্ছে। এটা সত্যিই খুব দুঃখজনক। কারণ, যতই ত্রুটি থাকুক না কেন, সমাজতান্ত্রিক প্রক্রিয়া যা আমরা সোভিয়েত ইউনিয়ন (১৯৩০-৫০) বা চিনে (১৯৫০-৭০) দেখেছি তার সঙ্গে কোনওভাবেই চলতি ঘটনার তুলনা চলে না। সরকারি/বেসরকারি পার্থক্য বাদ দিলেও অন্য একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় সোভিয়েত কিংবা চিনের শিল্পায়ন প্রচেষ্টার সঙ্গে রাজ্য সরকারের শিল্পস্থাপন 'ধামাকা'-র তফাত আছে।

সোভিয়েত বা চিনের শিল্পায়ন ভাবনাটা ছিল অনেকটা এই রকম : শিল্পায়ন হলে একদিকে যেমন সাধারণ মানুষের পণ্যের চাহিদা মিটবে, অন্যদিকে, ব্যাপক কর্মসংস্থান তৈরি হবে। ফলে, কৃষির উপর 'উদ্বৃত্ত' জনসংখ্যার চাপটাও অনেকটাই কমবে। আবার বিপুল সংখ্যায় মানুষ শিল্পক্ষেত্রে কাজ পেলে তাদের আয় বাড়বে। এতদিনকার ভুখা মানুষ হাতে পর্যাপ্ত টাকা পেলে শুধু শিল্পপণ্যই কিনবে না, বরং তার চেয়েও বেশি কিনবে কৃষিপণ্য—শস্য, অন্যান্য খাবার। তা ছাড়া কৃষিজ নগদ শস্য (cash crop) সাধারণের ভোগ্যপণ্য তৈরিতে শিল্পের কাঁচামাল হিসাবেও ব্যবহার হবে।

কৃষিপণ্যের চাহিদা বাড়লে চাষি ফসলের জন্য ভাল দাম পাবে। সে আরও নিবিড়ভাবে চাষ করতে উৎসাহিত হবে। ফসলের বিপুল চাহিদা ছোট ও প্রান্তিক চাষিকে যূথবদ্ধ হতে—সমবায়িত হতে উদ্বুদ্ধ করবে। এক ফসলি জমি বহু ফসলি হবে সমবায়ের উদ্যোগে ও সরকারি সহায়তায়। ফলে, চাষের কাজও বাড়বে। চাষের সঙ্গে যুক্ত মানুষের আয় বাড়বে। সেই বাড়তি আয় দিয়ে আবার শিল্পপণ্য কেনা হবে। এভাবেই একটা অর্থনীতিক আবর্ত ক্রমাগত বড় হতে থাকবে। কৃষি ও শিল্পের সামঞ্জস্য বজায় রেখেই।

অর্থাৎ, মোদ্দা কথাটা হল, শিল্পায়নে শুধু পরিচালকেরই নয়, শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকের, সমবায়িত খামারে যুক্ত চাষির—সকলের লাভ। সমস্ত কর্মী মানুষের স্বার্থ একই সূত্রে বাঁধা। বিশেষ করে, শিল্প-শ্রমিক ও কৃষি-কর্মীর স্বার্থের সঙ্ঘাত এই শিল্পায়ন ডেকে আনবে না। অন্তত সমাজতান্ত্রিক তাত্ত্বিকদের ভাবনাটা এরকমই ছিল।

কিন্তু এখন যা ঘটছে তা একেবারেই আলাদা। শ্রেণি সমন্বয়ের কথাটা যতই বিজ্ঞাপন দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা হোক না কেন বিভিন্ন বর্গের স্বার্থের সঙ্ঘাত স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে! রাজ্যে যে-সব আধুনিক শিল্প তৈরি হচ্ছে, সেখানে পণ্য তৈরি হবে প্রচুর কিন্তু সে অনুপাতে কর্মসংস্থান নগণ্য। যে ক'জন তথাকথিত উচ্চশিক্ষিত কাজ পাবে, তারা যে সাধারণ কৃষিজ ও শিল্পপণ্য—মোটা চাল, মোটা কাপড়—কিনবে না তা বলাই বাহুল্য। অর্থাৎ, একটা ছোট অংশের হাতে প্রচুর অর্থাগম হলেও সাধারণ শিল্প কিংবা কৃষিপণ্য কোনওটারই তেমন চাহিদা বাড়বে না। অথচ এ-সব শ্রমনিবিড় পণ্য উৎপাদন না বাড়লে ব্যাপক বেকারি ঘুচবে কী ভাবে?

বরং এই সব উচ্চকোটির মানুষের ভোগ্যপণ্য—শিল্পে তৈরি বিলাসদ্রব্য ও দামি ফসল যেমন, রংবেরঙের ফুল-ফল-সবজি এ সবের চাহিদা বাড়বে। তাই, একদিকে যেমন পুঁজি নিবিড় বিলাসদ্রব্য প্রস্তুতকারী শিল্প গড়ে উঠবে—যেখানে কর্মসংস্থান খুব কম অথচ বিশাল মুনাফার সুযোগ, অন্যদিকে আবার কৃষিকে ঢেলে সাজানো হবে যাতে উচ্চবিত্তের দামি ফুল-ফল-সবজি-মাছ-মাংসের চাহিদা মেটে। তাই ফসলের বৈচিত্রায়ণ দরকার। সমস্যা হল, এই বৈচিত্রায়ণে অনেক বেশি পটু বড় চাষিরাই যারা সহজেই উন্নত বীজ, সার, যন্ত্রপাতি পেতে পারে, আধুনিক সংরক্ষণ-প্রক্রিয়াকরণ-পরিবহনের সুযোগ নিতে পারে। লাভটা তাই বড় চাষির। দামি ফসল ফলানো ছোট স্বাধীন চাষির পক্ষে বেশিদিন সম্ভব নয়। অবশ্য বড় কোম্পানির সঙ্গে অসম চুক্তিতে আবদ্ধ হলে আলাদা কথা।

তাই শিল্পায়নের সত্যটা দাঁড়াল এই রকম : দুটো বড় ভাগ — একদিকে শিল্পপতি, শিল্পে সরাসরি নিযুক্ত কিছু তথাকথিত উচ্চশিক্ষিত আর ফসলের বৈচিত্রায়ণে পটু বড় চাষি, লাভটা এদেরই; অথচ বড় শিল্পের বাইরে যে বিশাল অসংগঠিত ক্ষেত্র, ছোট ও প্রান্তিক চাষি কিংবা লক্ষ লক্ষ কৃষিশ্রমিক, তাদের ভবিষ্যৎ? এই শিল্পায়নে সম্ভবত তাদের জন্য কিছুই নেই! সম্পূর্ণ স্বচেষ্টায় হাঁচড়-পাঁচড় করে 'উন্নয়ন' রথে উঠতে পারল তো ভাল কথা, না হলেই 'ফালতু' হয়ে যাওয়া।

(লেখক বিশ্বভারতীর অর্থনীতির অধ্যাপক)

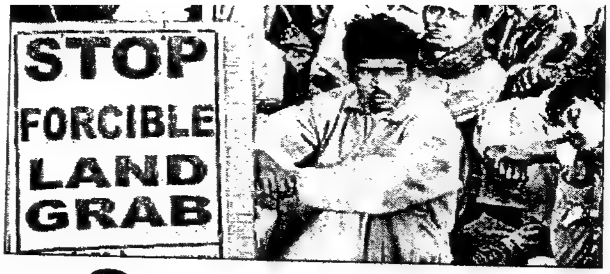

নন্দীগ্রাম : বুদ্ধিজীবী ও দলেই নয়, বিতর্ক প্রয়োজন সর্বস্তরে

সৌম্য চক্রবর্তী

সংবাদপত্র, টিভি চ্যানেল সর্বত্রই এখন বড় খবর হিসেবে হাজির নন্দীগ্রাম নিয়ে সর্বদলীয় বৈঠক। যুযুধান রাজনৈতিক দলগুলো মুখোমুখি বসে আলোচনা করে সমস্যা মেটাবে, এটাই আশা করা হচ্ছে। কিন্তু যাদের নিয়ে এই বৈঠক সেই নন্দীগ্রামের মানুষরা আলোচনার আবর্তে অনুপস্থিত। ভাবখানা এমন, সর্বদলীয় বৈঠকে যা ঠিক হবে তা 'সবাইকে বুঝিয়ে দেওয়া হবে' তা হলেই শান্তি আসবে।

সমস্যা দুটো। প্রথমত পদ্ধতিগত জটিলতা। নন্দীগ্রামের বীভৎসতায় যারা চূড়ান্ত ক্ষতিগ্রস্ত তাদের বাদ দিয়ে কোনও প্রক্রিয়া কী দীর্ঘস্থায়ী সমাধান দিতে পারে? এক্ষেত্রে সম্ভবত ওই 'বুঝিয়ে বলাটাই' শেষ ভরসা। কিন্তু আরও বড় একটা প্রশ্ন থেকে যায় এই প্রক্রিয়ার নীতিগত ভিত্তি নিয়েই। এই তথাকথিত উন্নয়নে যাদের ক্ষতি/লাভ (?) তাদের না জড়িয়ে মতামতের তোয়াক্কা না করে একটা সমাধান কিছু রাজনৈতিক দলের মাথারা বসে ঠিক করে দেবে, এটা কী উচিত? শুধু নন্দীগ্রামের নির্দিষ্ট বিষয়টাই নয়, সমস্ত উন্নয়ন বিতর্কটাকেই সাধারণ মানুষ বিশেষ করে যারা এই প্রক্রিয়ায় কোনও না কোনওভাবে যুক্ত, প্রাথমিকভাবে হলেও ক্ষতিগ্রস্থ, তাদের কাছে নিয়ে যাওয়া দরকার।

এটা বিশেষভাবে জরুরি, কারণ, এই তথাকথিত শিল্পায়ন প্রক্রিয়া অসংখ্য মানুষকে উদ্বাস্তু করতে পারে--তাদের কাজ থেকে উচ্ছেদ হয়ে যেতে হতে পারে। যদি কোনও তাত্ত্বিক বলেন, এই উচ্ছেদ সাময়িক প্রক্রিয়া তবে তার সপক্ষে সমস্ত যুক্তি-তথ্য প্রমাণ সব মানুষের মতামতের জন্য জানাতে হবে। শেষ বিচারে ক্ষতি বা লাভ তো ওইসব মানুষেরই।

আসলে, উপর থেকে বৈঠক করে 'উন্নয়ন' বিষয়ে সব কিছু ঠিক করে ফেলা তারপর 'বুঝিয়ে বলা'--এসবের মূল ভিত্তিটা লুকিয়ে আছে চলতি অর্থনৈতিক তত্ত্ব চর্চায়। প্রতিষ্ঠিত অর্থনীতির তত্ত্বে এমনটাই বলা হয়, যেখানে অনেক মানুষের স্বার্থ জড়িত সেখানে একমাত্র সরকারই বাইরে থেকে সব কিছু ঠিক করে দিতে পারে--কোনটা উন্নয়ন/কোন পথে উন্নয়ন -এইসব। কারণ, অনেকে মিলে একটা সমাধানে পৌঁছনো সম্ভব নয়, অনেকের স্বার্থ একটা সূত্রে বাঁধা/সূত্রায়িত করা উচিৎ নয়, এটা নাকি শৃঙ্খল! সে-সব করতে গেলে দ্বন্দ্ব বাড়বে, কোনও পথ পাওয়া যাবে না।

কিন্তু সে তো স্বার্থের কথা! ব্যক্তিগত স্বার্থ নিয়ে চলা এক একটা মানুষ স্বার্থপরের মতো শুধু নিজের ভালটুকু দেখবে, এটাই সেই অর্থনীতি চর্চার ভিত্তি-সেই তত্ত্বের ভিত্তি। যেহেতু মানুষ স্বার্থপর, সে শুধুমাত্র নিজের কথাই ভাবে। তাই, কোনও যৌথ সমাধানে পৌঁছনো তার পক্ষে নাকি অসম্ভব। কিন্তু এই ভাবনায় একটা কথা ভুলে যাওয়া হয়--মানুষ ব্যক্তিস্বার্থ নিয়ে চললেও শেষ পর্যন্ত সে সমাজবদ্ধ জীবনে অভ্যস্ত। মানুষই এই সমাজ তৈরি করেছে--ব্যক্তি-মানুষ সমাজের নিয়মে নিজেকে বেঁধেছে। সমাজের সব বাঁধনই শৃঙ্খল নয়! বরং যৌথতা সেই সামাহিকতার ভিত্তি। পারস্পরিক দেওয়া-নেওয়া সামাজিক হয়ে ওঠার প্রক্রিয়া। এই যৌথতার--ব্যক্তিস্বার্থের বাইরে গিয়ে সামাজিক হয়ে ওঠার--'ক্ষমতা'/বোধ মানুষের আছে। তাই, মানুষ শুধুমাত্র ব্যক্তিস্বার্থই দেখবে, এটা ভেবে নেওয়া কি ঠিক।

এখানেই আদর্শের ভূমিকা। মানুষের সামাজিক বোধকে সজাগ করে তোলা গেলে, ব্যক্তিস্বার্থের উর্ধ্বে উঠে সামাজিকভাবে উন্নততর জীবনের ভাবনা সেও ভাবতে পারে। এটা তো তার সামাজিকতাই প্রমাণ করে। কিন্তু উপর থেকে চাপিয়ে দিয়ে নয়, সামাজিক প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়েই তাঁকে সর্বব্যাপী করে ফুটিয়ে তোলা দরকার। তাই উন্নয়ন সংক্রান্ত সব ভাবনা-চিন্তা বিশেষ করে সমাজের তথাকথিত নিচুতলার মানুষের কাছে নিয়ে যেতে হবে। সেই চিন্তা মানুষ নিজের বোধ/অভিজ্ঞতা দিয়ে বিচার করে দেখবে। এভাবে সমাজের শেষস্তর পর্যন্ত দীর্ঘ বিতর্কের অবকাশ দিতে হবে। এটা উচ্চকোটির মানুষের ভুল ধারণা--তার নিজের তৈরি করা ধারণা-যে, নিচের তলার মানুষ কোনওভাবেই নিজের ভাল বোঝে না। অথচ, একটা অঞ্চলের মানুষ তার নিজের জায়গার সম্পদ এবং প্রয়োজন সম্পর্কে সচেতন। দরকার শুধু নানান অঞ্চলের মধ্যে সমন্বয় সাধন। 'উপর তলার' মানুষের উন্নয়ন ভাবনা 'নিচের তলার মানুষের কাছে অচল মনে হতেই পারে। তাই শুধু দল বা বুদ্ধিজীবী মহলেই নয়, সবস্তরে বিতর্ক জরুরি।

তবে শাসকরা বা সমাজের 'উপর তলা' সে সব চায় না; তারা উন্নয়নকে নিজের সুবিধে মতো সাজিয়ে নিতে চায়। তাই উন্নয়ন নিয়ে সমাজের সর্বত্র বিতর্ক হবে, এটা করতে গেলেও প্রবল লড়াই দরকার। সমাজের তথাকথিত নিচু তলাকে সে লড়াইয়ে জিততে হবে। অধিকার সে এমনি পাবে না। না হলেই, সর্বদলীয় বৈঠক, আর তারপর শুধু 'বুঝিয়ে দেওয়া'।

শিল্পায়নে কৃষির আয় বাড়বে তো? তথ্য অন্য কথা বলছে

সৌম্য চক্রবর্তী

রাজ্যের শিল্পায়নের সমর্থনে একটা বড় যুক্তি হল, শিল্প এলে, কাজ পাওয়ায় মানুষের হাতে বেশ কিছু টাকা আসবে। আর আয় বাড়লে কৃষিপণ্যের চাহিদা বাড়ে, ফলে শিল্পায়নে চাষিরও লাভ। অর্থাৎ, আধুনিক শিল্প হলে ফসলের অভ্যন্তরীণ বাজারটাও নাকি চাঙ্গা হবে, তাই চাষির আয়ও বাড়বে। এমনটাই দাবি।

আর এই একই যুক্তিতে বারেবারেই দেশের অন্য কয়েকটা রাজ্যের উদ্যাহরণও টানা হচ্ছে। কর্নাটক, মহারাষ্ট্র কিংবা তামিলনাড়ুতে শিল্পায়ন হওয়ায় সেখানকার চাষিরাও নাকি ভাল আছেন। শিল্পায়নে কৃষিপণ্যের বাজার বেড়েছে, ফলে ফসলের দাম পাওয়ার সমস্যাও কমেছে। এমনটাই প্রচার করা হচ্ছে। কিন্তু এসব বলার সময় হাজার হাজার চাষির আত্মহত্যার ঘটনাগুলো চেপে যাওয়ার চেষ্টা চলছে। বলার চেষ্টা হচ্ছে, "ওগুলো বিচ্ছিন্ন ঘটনা"। কিন্তু নিচের সারণিতে চোখ বোলালে এটা বুঝতে মোটেই অসুবিধে হয় না যে, কর্নাটক, মহারাষ্ট্র, তামিলনাড়ুর চাষিরা একেবারেই ভাল নেই। শিল্পায়ন 'ধামাকা' তাদের ছুঁতে পারেনি। বেঙ্গালুরু, মুম্বই আর চেন্নাই-এর রোশনাই বেড়েছে মাত্র।

এটা হওয়াই স্বাভাবিক। কারণ, আধুনিক শিল্পে তো প্রত্যক্ষ কর্মসংস্থান খুবই সামান্য; ব্যাপক সংখ্যক মানুষের আয় বাড়বে কীভাবে? তাই, কৃষিপণ্যের চাহিদা বাড়ার প্রশ্নই ওঠে না। আধুনিক বড় শিল্প-সংলগ্ন অসংগঠিত ক্ষেত্রে পরোক্ষ কর্মসংস্থান হয় ঠিকই, কিন্তু সেখানে আয় এত কম যে ফসলের চাহিদা তেমন একটা বাড়ে না। না হলে চাষি, বিশেষ করে, ছোট চাষি অন্ধকারেই থেকে যায়। শিল্পায়নের হ্যালোজেন তাকে আলোকিত করতে পারে না। আসল কথাটা হল, ব্যাপক সংখ্যার দরিদ্র-অভুক্ত মানুষগুলোর হাতে কাজ দিতে পারলে তবেই ফসলের চাহিদা বাড়বে— চাষির আয় বাড়বে। 'শহরের শিল্পায়ন' তা পারে না।

	পরিবার পিছু গড় মাসিক কৃষি আয় (টাকায়)			
পরিবারের জমির পরিমাণ (হেক্টর)	কৃষির নীট আয় (পঃ বঙ্গ)	কৃষির নীট আয় (তামিলনাড়ু)	কৃষির নীট আয় (মহারাষ্ট্র)	কৃষির নীট আয় (কর্নাটক)
.০১-.৪০ হেক্টর	৩৩৪	২৬৫	৩৮১	২০৬
.৪১-১ হেক্টর	১০৫৩	৫১৯	৭৯১	৬২৮
১.০১-২ হেক্টর	২২২৫	৯৭৮	১৪৪০	১৫২৩
২.০১-৪ হেক্টর	৪৬২১	২৪৫০	২৫০২	২৫৪৯
৪.০১-১০ হেক্টর	৫২৬৩	৮৮২১	৪৪৩১	৪৪০৫

তথ্যসূত্র ঃ- এন. এস. এস. ও (ভারত সরকার) রিপোর্ট : ৪৯৭; ডিসেম্বর ২০০৫।

সারণির দিকে চোখ ফেরালে দেখব, তিনটে রাজ্যের প্রায় এক শ্রেণির চাষির তুলনাতেই এ-রাজ্যের অবস্থা ভাল! বিশেষ করে, একেবারে ক্ষুদ্র চাষি (জমির পরিমাণ : ০১-.৪০ হেক্টর) ও বড় চাষি (জমির পরিমাণ : ৪.০১-১০ হেক্টর) বাদ দিলে এ-রাজ্যের বাকি চাষি-পরিবারগুলোর গড় মাসিক কৃষি-আয় অন্য তিনটে রাজ্যের সাপেক্ষেই বেশ বেশি। অথচ, আমাদের নাকি কর্নাটক, মহারাষ্ট্র, তামিলনাড়ুর মতোই শিল্পায়ন করতে হবে, রীতিমতো কম্পিটিশন করে; তাতেই নাকি কৃষিভিত্তি আরও সুদৃঢ় হবে! কিন্তু তথ্য যে অন্য কথাই বলছে। তাহলে কি আমরা কৃষিতে পিছন দিকে হাঁটব? অন্যদিকে, সাম্প্রতিক রিপোর্ট বলছে, এ-রাজ্যের আনাচে কানাচে ছড়িয়ে আছে অনেক আমলাশোল। এ-এক বিচিত্র বৈপরীত্য! অর্থনীতিবিদদের কেউ কেউ বলছেন শিল্প এলে এইসব হতদরিদ্র মানুষেরা কাজ পাবেন; তাতে সার্বিক আয় বাড়লে চাষিরও লাভ। কিন্তু এ-যে অলীক কল্পনা! আধুনিক শিল্প এদের কাজ দেবে, এটা অসম্ভব।

এ-সব কারণেই প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক, আঞ্চলিক শিল্প তেমন একটা নেই তবুও কৃষিতে আয় পশ্চিমবঙ্গে বেশি হল কীভাবে? শহরে বড় শিল্প নেই ঠিকই, কিন্তু এ রাজ্যের ক্ষুদ্র-মাঝারি শিল্প ও পরিষেবা ক্ষেত্রের যে যথেষ্ট প্রসার ঘটেছে তার অনেক প্রমাণ চারিদিকে ছড়িয়ে আছে— সরকারি তথ্যও আছে। অথচ, সেই বিশাল ক্ষেত্রের দিকে কোনওদিনই সরকারের তেমন নজর নেই। সব মিলিয়ে এক কোটির কাছাকাছি মানুষ ওইসব ক্ষুদ্র শিল্প ও পরিষেবা উদ্যোগগুলোর সঙ্গে যুক্ত। এই শিল্প-পরিষেবা ক্ষেত্রের সঙ্গে কৃষির যোগাযোগও খুবই নিবিড়। অসংগঠিত ও ক্ষুদ্র শিল্প, পরিষেবা আর কৃষি— এই তিনটি ক্ষেত্র মিলে যে মিথস্ক্রিয়া চলেছে গত আট ও নয়ের দশকে, তাতেই কৃষির আয়ও বেড়েছে। আসলে, এই বিরাট অকৃষি ক্ষেত্রই কৃষির অভ্যন্তরীণ বাজার তৈরি করেছে। আবার উল্টোদিকে, কৃষিক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত কয়েক কোটি মানুষকে জুগিয়েছে কৃষি উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় মাল-মসলা-যন্ত্রপাতি আর সস্তা ভোগ্য-পণ্য।

আধুনিক শিল্প আমদানি করে কৃষির আয় বাড়ানোর পরিকল্পনা আদতে এক সর্বনাশা প্রক্রিয়ার জন্ম দিতে পারে। এসবে কৃষির আয় তো বাড়বেই না, উপরন্তু গড়ে ওঠা বিরাট ক্ষুদ্র শিল্প ও পরিষেবা ক্ষেত্রের সমূহ বিপদ হবে। তাতে কিন্তু কৃষিরও বিপদ!

কৃষি জমির কিছুটা অন্তত ছেড়ে দিয়ে একটা মীমাংসার চেষ্টার কথা

শিল্পায়নে কৃষকেরও মুক্তি : তথ্য কিন্তু অন্য কথা বলছে

সৌম্য চক্রবর্তী

আমাদের রাজ্য সরকার শিল্পায়নের যে গল্পটা ঢাক-ঢোল পিটিয়ে প্রচার করছে তার একটা অধ্যায় এই রকম : বড় আধুনিক শিল্প হলে কারখানার বাইরেও একটি কর্মযজ্ঞ তৈরি হবে। চারপাশে গড়ে উঠবে শহর, নানারকম কাজের সুযোগ আসবে। বাজার-দোকান লাগবে, পরিবহনের পরিষেবা লাগবে। এরকম আরও কত কী। সবজি বিক্রি, দোকানদারি, অটো/ভ্যান/রিকশা চালানো। তা ছাড়া বাড়িতে বাড়িতে কাজের লোক লাগবে— নানা কাজের মিস্ত্রি লাগবে। এমনকী বড় শিল্পের টানে যন্ত্রপাতির ছোট ছোট পার্টস আর কাঁচামালের চাহিদা হবে। সে সব তৈরির কাজ জানলে জুটতে পারে স্বনিযুক্তির সুযোগ। এমনটাই প্রচার চলছে।

এর সমর্থনে হাজির করা হচ্ছে অন্য কিছু রাজ্যের উদাহরণ, পুনে, চেন্নাই কিংবা গুরুগাঁওয়ের গল্প। বলা হচ্ছে, তামিলনাড়ু, মহারাষ্ট্র, কর্নাটকে শিল্পায়ন হওয়ায়, বড় শিল্পের বাইরেও বাকি অনেক কাজ তৈরি হয়েছে। রাজ্য সরকার তাই রীতিমতো বিজ্ঞাপন দিয়ে বলছে, শিল্প এলে শুধু শহরেরই নয় গ্রামের ছেলেমেয়েরাও স্বনির্ভর হওয়ার সুযোগ পাবে। চাষ তেমন আয় দিচ্ছে না, তাই কৃষক পরিবারের ছেলেমেয়েরাই উন্মুখ অকৃষি ক্ষেত্রে কিছু করার জন্য। তারা কৃষির বাইরে গিয়ে ছোটখাট ব্যবসা, স্বনিয়োগ ভিত্তিক ক্ষুদ্র শিল্প করতে চাইছে। ভাল কথা। কিন্তু সরকারের দাবি, সেটা করতে গেলে আমাদের নাকি তামিলনাড়ু-কর্নাটক-মহারাষ্ট্রের পথে হাঁটা ছাড়া গতি নেই। ও পথেই হাঁটতে হবে, বরং আরও জোরে! সেখানে নাকি শিল্পের জোরেই গ্রাম/মফস্বলের অকৃষিতে প্রচুর কাজ। তাই চাষি পরিবারগুলি চাষ ছাড়াও নাকি অন্যান্য ব্যবসার অনেক সুযোগ পাচ্ছে।

রাজ্যের কর্ণধাররা এসব প্রচার করছেন। মাঠে-ময়দানে, ঠাণ্ডা ঘরের সেমিনারে, কিংবা স্কুল/কলেজে বক্তৃতায় এসব বলছেন— লিখছেন। কিন্তু তথ্য যে অন্য কথা বলছে!! গত কিস্তির লেখায় (সংবাদ প্রতিদিন, ৬/৬/০৭) দেখেছিলাম, পশ্চিমবঙ্গে কৃষি-আয় তামিলনাড়ু, কর্নাটক, মহারাষ্ট্রের থেকে বেশিই। এটা প্রায় সব শ্রেণির চাষির ক্ষেত্রেই সত্যি। সেরকমই কৃষক-পরিবারের অকৃষি ক্ষেত্রের ছোট ব্যবসা থেকে পাওয়া আয়ের হিসাবটাও রাজ্য সরকারের গল্পটাকে গুলিয়ে দিতে পারে! ছেলে-ভোলানো গল্পে বাদ সাধছে এই সব তথ্য।

কৃষক পরিবার পিছু গড় মাসিক অকৃষি (ব্যবসার) আয়

পরিবারের জমির পরিমাণ (হেক্টর)	কৃষক পরিবারের অকৃষি ব্যবসা থেকে পাওয়া নিট আয় (টাকা)			
	পশ্চিমবঙ্গ	তামিলনাড়ু	মহারাষ্ট্র	কর্নাটক
০ — ০.০১	৩৯৩	১৬১	১৮৮	১৩৫
০.০১ — ০.৪০	৪০০	২৫৫	২০১	৩০২
০.৪১ — ১.০০	২৭৫	১৩৭	২১৪	১২২
১.০১ — ২.০০	৫৭২	১৪১	৬৫	১২০
২.০১ — ৪.০০	৪২৭	১৯৯	২২১	১৫২
৪.০১ — ১০.০০	৩৪৪	৮৪	১২৯৫	১১২

তথ্যসূত্র : এনএসএসও (ভারত সরকার); রিপোর্ট : ৪৯৭(২০০৫)

সারণির দিকে তাকালে দেখব, মহারাষ্ট্রের একটি মাত্র শ্রেণি (৪.০১-১০.০০ হেক্টর জমি) বাদ দিয়ে বাকি সমস্ত পরিবারের মধ্যে এ-রাজ্যের অবস্থা সবচেয়ে ভাল। অর্থাৎ, কৃষির আয়ের মতোই, চাষি পরিবারের অকৃষি ব্যবসা থেকে আয়ের হিসাবেও পশ্চিমবঙ্গ অন্য শিল্পোন্নত রাজ্যগুলির থেকে অনেক এগিয়ে। ওই সব রাজ্যের শিল্পায়ন চাষি পরিবারকে কৃষির বাইরে স্বনির্ভরতা খুঁজে নিতে মোটেই সাহায্য করেনি। শিল্প হলে শহর হবে, সেখানে ছোটখাট ব্যবসার সুযোগে চাষি-বাড়ির ছেলে বা মেয়েটা নিজের পায়ে দাঁড়াবে, এটা গল্পই থেকে গিয়েছে— অর্থনীতির তত্ত্বের গল্প; কিন্তু বাস্তব হয়ে ওঠেনি।

বরং পশ্চিমবঙ্গের কৃষিতে খানিকটা যা উন্নতি আট-ন'য়ের দশকে হয়েছে, তার উপর ভিত্তি করেই একেবারে ক্ষুদ্র থেকে বড় চাষি পরিবার অকৃষি ক্ষেত্রে বেশ কিছু কাজকর্ম (ক্ষুদ্র স্বনিয়োগ ভিত্তিক শিল্প কিংবা পরিষেবা) খুঁজে নিয়ে উন্নতি করেছে। এই গ্রামীণ ও মফস্বলের ক্ষুদ্র ও অসংগঠিত শিল্প-পরিষেবা ক্ষেত্র ঠিক কতটা শক্তিশালী? বুদ্ধবাবু, নিরুপমবাবুদের সই করা 'পশ্চিমবঙ্গ মানব উন্নয়ন রিপোর্ট, ২০০৪'-ই বলছে, কৃষি উন্নতির উপর নির্ভর করে এই অকৃষি ক্ষেত্র এতটাই গতিশীল যে ন'য়ের দশকে এটাই শিল্পের ৭ শতাংশ বার্ষিক বৃদ্ধি এনেছে; অথচ এই সময়ে সংগঠিত ক্ষেত্র প্রায় বাড়েইনি!

অর্থাৎ, রাজ্যে যে কৃষিভিত্তিক শিল্পায়ন ইতিমধ্যেই ঘটেছে এবং তা যে যথেষ্ট শক্তিশালী তা সরকারের কর্ণধাররা ভালই জানেন। অন্যান্য রাজ্যের তথ্যগুলিও তাঁদের অজানা নয়। তবুও তাঁরা উন্নয়নের আষাঢ়ে গল্প শোনাচ্ছেন—আধুনিক শিল্পায়নে নাকি চাষি পরিবারের দারুণ লাভ!

(লেখক বিশ্বভারতীর অর্থনীতির অধ্যাপক)

আধুনিক বনাম গ্রামীণ শিল্প : ভিত্তি ভেঙে ভবিষ্যৎ

সৌম্য চক্রবর্তী

কেন শিল্পায়ন দরকার তা বোঝাতে গিয়ে রাজ্যের কর্তাব্যক্তিরা ইদানীং বেশ কিছু যুক্তি খাড়া করছেন, যার কয়েকটি তাঁদের পক্ষেই যে অস্বস্তিকর হতে পারে তা হয়তো তাঁরা ভেবে দেখছেন না। মুখ্যমন্ত্রী তাঁর সাম্প্রতিক পার্টিপুস্তিকাতেও সেরকম কিছু কথা উল্লেখ করেছেন।

শিল্পের পক্ষে জোরদার সওয়াল করতে গিয়ে বলা হচ্ছে, পশ্চিমবঙ্গের গ্রামে মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বেড়েছে; অন্যান্য অনেক রাজ্যের থেকেই তা বেশি। গ্রামের মানুষের খরচ করার ক্ষমতা বাড়ায় শিল্পপণ্যের চাহিদা তৈরি হয়েছে। এখন নাকি, মোটর সাইকেল, মোবাইল ফোন, ছোট গাড়ি, মানুষ এসবই চাইছেন। তাই আধুনিক শিল্প দরকার। শিল্পায়নের দাবিতে মিছিল-মিটিং চলছে।

সমস্যা হল, এই যে তত্ত্ব দেওয়া হচ্ছে তা অর্ধসত্য—'অশ্বথামা হত, ইতি গজ'-র মতোই তা বিপজ্জনক। তথ্য হয়তো ঠিকই, কিন্তু গল্প বলায় গণ্ডগোল আছে। তথ্যের দিকে তাকালে দেখব, সত্যিই রাজ্যের কৃষকদের ক্রয়ক্ষমতা বেশি। তথাকথিত শিল্পোন্নত রাজ্য মহারাষ্ট্র, তামিলনাড়ু কিংবা কর্নাটক—এতসব শিল্প এনেও বিশেষ সুবিধা করতে পারেনি। এই লেখার সঙ্গে সারণী সেকথাই বলছে। এ-রাজ্যের সব শ্রেণির চাষি পরিবারেরই (মহারাষ্ট্রের একেবারে ছোট জমি মালিকদের বাদ দিয়ে) খরচ করার প্রবণতা অন্য রাজ্যের তুলনায় ভাল।

কৃষক পরিবারের গড় মাসিক ভোগব্যয় (টাকায়)

পরিবারের জমির পরিমাণ (হেক্টর)	পঃ বঙ্গ	মহারাষ্ট্র	তামিলনাড়ু	কর্নাটক
০-০.০১	২৩০৮	২০০৮	২৩৯৬	২০৮২
০.০১-০.৪০	২৩২০	২২৩৩	২৪২৭	২৩১২
০.৪১-১.০০	২৯৭৪	২৫৬৬	২৫৫৩	২৩০৪
১.০১-২.০০	৩৮৭৭	৩১৮৭	২৫৮৩	২৬৯৩
২.০১-৪.০০	৪৭৫৪	৩৬৯১	৩০২৬	৩২৬২
৪.০১-১০.৫০	৫২৩৪	৩৭৯৩	৩৮৭৭	৩৫৬৩

তথ্য সূত্র : এন এস এস ও (ভারত সরকার) রিপোর্ট : ৪৯৭; ডিসেম্বর ২০০৫

এ থেকেই বলা হচ্ছে, রাজ্যের শিল্পপণ্য দরকার—তাই নাকি শিল্পায়ন দরকার। ব্যাপারটা একটু বুঝে নেওয়া উচিত। সরকার সবদিক ভেবে দেখেছে তো! প্রশ্ন হল, চাষি পরিবারের খরচ তো বেশি, কিন্তু তার রসদ আসছে কোথা থেকে? তার মানে নিশ্চয়ই রাজ্যের কৃষক পরিবার পিছু আয় তুলনায় বেশি। অন্য রাজ্যের শিল্পায়ন/উন্নয়ন (?) চাষির আয় তেমন একটা বাড়ায়নি। পরের প্রশ্নটাই হতে পারে, শিল্প ছাড়াই চাষের আয় এ-রাজ্যে বেশি হল কীভাবে? এখানেই সরকারি গল্পে বড় ফাঁক।

কৃষির আয় বেশি হতে গেলে ফসলের যথেষ্ট বিক্রি দরকার; আর সেটা হতে হবে অকৃষি ক্ষেত্রে। চাষির খরচ তো আর সব মিলিয়ে কৃষিক্ষেত্রের আয় বাড়াতে পারে না। পশ্চিমবঙ্গে কৃষি আয় বেশি মানেই তার অকৃষিও শক্তিশালী, না হলে ফসল কিনছে কারা; রাজ্যের বাইরে রফতানিই তো সব নয়। অর্থাৎ, এ-রাজ্যে ইতিমধ্যেই অকৃষি ক্ষেত্রের (যেমন গ্রামীণ শিল্প-পরিষেবা) খানিকটা অগ্রগতি হয়েছে। সেখানে আয় বেড়েছে। তাই সেখানেই বিক্রি হচ্ছে ফসলের সিংহভাগ। ফলে চাষিরও লাভ।

এর উল্টোদিকের প্রক্রিয়াটাও খুবই জরুরি। অকৃষি ক্ষেত্র যে জিনিসপত্র তৈরি করছে তার সবটা নিশ্চয়ই ওই ক্ষেত্রেই ব্যবহার হচ্ছে না। বরং, বেশিরভাগটাই কিনছে কৃষি ক্ষেত্রের মানুষ। আর ঠিক সেই কারণেই তো পশ্চিমবঙ্গের কৃষি পরিবারের ভোগব্যয় অন্য রাজ্যের তুলনায় বেশি। চাষি পরিবার ফসল বিক্রি করে যা পাচ্ছে, তা দিয়ে গ্রামীণ শিল্পপণ্য কিংবা মফস্বলের ছোট কারখানায় তৈরি হওয়া রকমারি জিনিস কিনছে। অন্যদিকে ওই উদ্বৃত্ত ফসলের জোরেই টিকে আছে রাজ্যের অকৃষির সঙ্গে যুক্ত কোটি কোটি মানুষ। এই ক্ষেত্র হয়তো ততটা 'গ্ল্যামারাস' নয়, কিন্তু বিরাট এবং বিস্তৃত।

কৃষি-অকৃষি মিলে রাজ্যের যতটুকু উন্নতি হয়েছে তার অনেকটাই মানুষের বেঁচে থাকার—পথ খুঁজে নেওয়ার অদম্য ইচ্ছায়—সরকারের কৃতিত্ব তাতে সামান্যই। অথচ, সরকার কৃষি-অকৃষির সেই মিথস্ক্রিয়াকে ভাঙতে উদ্যত—বাইরে থেকে বড়লোকের শিল্পায়ন আমদানি করে।

‘শিল্পায়নের সেকাল একাল’ দু’য়ের তফাত অনেক

সৌম্য চক্রবর্তী

প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের জন্মদিন পালন নিয়ে বিতর্কে শিল্পায়ন সংক্রান্ত কিছু প্রশ্ন উঠে আসাই স্বাভাবিক। এই বিতর্ক শিল্পায়নের সেকাল-একাল নিয়ে প্রশ্নগুলিকে ঝালিয়ে নিতেই সাহায্য করবে বলে আশা রাখি। আপাতদৃষ্টিতে সাদামাটা মনে হলেও রাজ্যের সবচেয়ে বড় সরকারি দলটির এই বিতর্কে জড়িয়ে পড়াটা যথেষ্টই তাৎপর্যপূর্ণ। ‘বাংলার রূপকার’ বিধানচন্দ্র রায়ের জন্মদিন পালন করে এটাই প্রমাণের চেষ্টা চলছিল যে বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী, তাঁর সরকার, তাঁর দল শিল্পায়নে একনিষ্ঠ। কিন্তু বিধান রায়ের ‘শিল্পায়ন’ আর বুদ্ধবাবুর ‘উন্নয়ন’ কী একই প্রক্রিয়া! এ নিয়ে প্রশ্ন ওঠাই স্বাভাবিক। বিতর্কটা চলছিল রাজনৈতিক স্তরে। কিন্তু অর্থনীতির গণ্ডিতেও একটা বিতর্ক তৈরি হতে বাধ্য।

প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী যে শিল্পায়নের পথে হেঁটেছিলেন সেখানে বড় শিল্পের প্রাধান্য ছিল ঠিকই, কিন্তু পুরো প্রক্রিয়াটাই চলেছিল সরকারের সরাসরি নিয়ন্ত্রণে, সরকারের সামগ্রিক পরিকল্পনা-মাফিক। বিপুল পরিমাণ সরকারি বিনিয়োগ ছিল; বিশেষ করে পরিকাঠামো নির্মাণে একটা বড় উল্লম্ফন হয়েছিল। এ ছাড়া সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় ভারী শিল্পও এগিয়েছিল। বিদেশি সরকারের পুঁজি লগ্নি হলেও সেখানে সরকারি নিয়ন্ত্রণ ছিল যথেষ্ট শক্ত।

আর বুদ্ধবাবুর শিল্পায়নের কর্ণধাররা হলেন দেশি-বিদেশি পুঁজিপতিরা। তারা কোনও সরকারি নিয়ন্ত্রণ মানতে নারাজ। যেখানেই জমি চাইবেন, সেখানেই তাদের কারখানা করার জমি দিতে হবে, কোনও বাছ-বিচার চলবে না। কোন চুক্তিতে তারা জমি নেবেন, সাধারণ মানুষ তা জানতেও পারবে না। সরকারি নিয়ন্ত্রণ তো দূর অস্ত, তথ্য জানার অধিকারটুকুও নেই। তাই পাঁচ-ছয়ের দশকের শিল্পায়ন আর এখনকার কর্পোরেটাইজেসন্-এ বিস্তর ফারাক।

সরকারি/ বেসরকারি ফারাকটা ছাড়াও আরও একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তফাৎ এই দুই শিল্পায়ন প্রক্রিয়ায় রয়েছে, যা চোখ এড়িয়ে যেতে পারে না। নেহরু-মহলানবিশ-বিধান রায়ের শিল্পায়ন স্লোগানের একটা বড় জায়গা ছিল এটাই— বড় শিল্প হলে তার টানে অসংখ্য ছোট-মাঝারি শিল্প হবে যারা একদিকে বড় শিল্পকে জোগাবে উৎপাদন সামগ্রী আর অন্যদিকে তৈরি করবে দৈনন্দিন ব্যবহারের সাধারণ ভোগ্যপণ্য। আবার সবমিলিয়ে শিল্পায়নের ধাক্কায় সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বাড়লে যেমন শিল্পদ্রব্যের ব্যাপক চাহিদা হবে, তেমনই খাদ্যের প্রয়োজনও যথেষ্ট বাড়বে। ফসলের দাম বাড়বে। চাহিদা মেটাতে ফলনও বাড়াতে হবে। ফলে, চাষও আয় দেবে। চাষি লাভবান হবেন। আবার চাষ বাড়লে, কৃষি-শ্রমিকেরও ক্রয়ক্ষমতা বাড়বে। এভাবেই শিল্প-কৃষি মিলিয়ে সার্বিক উন্নতির একটা পরিকল্পনা হয়েছিল। বলা হয়েছিল, শিল্প হলে শিল্পের শ্রমিক-কর্মচারী থেকে শুরু করে চাষি, কৃষি-শ্রমিক সবারই লাভ। সেকালের শিল্পায়নে তাই কর্মসংস্থান তৈরি ছিল অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। বড় শিল্প হলেও সেই শিল্পে সরাসরি (কারখানার ভিতরেই) কতটা কর্মসংস্থান তৈরি হবে, তা ছিল একটা প্রধান আলোচনার বিষয়। কর্মসংস্থান তৈরির একটা অন্তত রূপরেখা ছিল। সরকারের অন্যতম প্রধান কর্তব্য ছিল কর্মসংস্থান তৈরি। কারণ, শিল্পে সরাসরি কাজ পেলে বহু মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বাড়বে। ফলে, পণ্যের বিরাট অভ্যন্তরীণ বাজার তৈরি হবে। এতে ছোট/ মাঝারি ব্যবহারিক শিল্পপণ্য উৎপাদনকারী থেকে শুরু করে ছোট-মাঝারি চাষি সবার লাভ। শত সমস্যা সত্ত্বেও এই ‘শিল্প-পরিকল্পনা’কে আজকের চাপিয়ে দেওয়া ‘শিল্পায়ন ধামাকা’র সঙ্গে গুলিয়ে ফেলা উচিত নয়।

দুর্গাপুর স্টিল প্ল্যান্টের উদ্বোধনে মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায়

এখন কর্মসংস্থান তৈরির সব দায় যেন বেসরকারি পুঁজির। এটা নাকি পুঁজির সামাজিক দায়িত্ব। আসলে, কর্মসংস্থান হবে বেসরকারি বড় পুঁজির মর্জিমাফিক। পুঁজির লক্ষ্য যে কর্মসংস্থান তৈরি নয়, আমরা সবাই জানি। আধুনিক বড় বেসরকারি সংস্থায় ব্যবহার হবে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি, সেখানে কর্মসংস্থান সামান্যই। উচ্চকোটির অল্প কিছু তথাকথিত দক্ষ শ্রমিকের সেখানে আনা-গোনা। আর কারখানার বাইরে বিশাল অসংগঠিত ক্ষেত্র। তার দায়িত্ব কে নেবে? তাদের না আছে ঠিকমতো আয় না, চাকরির নিরাপত্তা কিংবা সামাজিক সুরক্ষা। তাই, এই শিল্পায়নে ব্যাপক অংশ মানুষের আয় তেমন বাড়বেই না। আর তা না হলে চাষের সঙ্গে যুক্ত কোটি কোটি মানুষেরও উন্নয়ন অসম্ভব।

বিধান রায়ের শিল্পায়ন যেমন ব্যাপক বেকারি দূর করতে পারেনি। তৈরি করেছে একটা ছোট মধ্যবিত্ত শ্রেণি। তেমনই বুদ্ধবাবুর শিল্পায়নও স্লোগান-সর্বস্ব না, হয়ে পড়ে! স্লোগান আর ব্যাপক মানুষকে জড়িয়ে তিলে তিলে গড়ে তোলা সার্বিক উন্নয়ন— এ দুটো তো আর এক নয়!

বিয়েবাড়ির বিভীষিকা, ট্রাডিশন চলছে চলবে

সৌম্য চক্রবর্তী

এ-সপ্তাহের কলামে একটু অন্যরকম বিষয় নিয়ে লেখার ইচ্ছে হল। কী লিখি, কী লিখি, সুনীতা উইলিয়ামস না বন্যা পরিস্থিতি, এসব ভাবতে ভাবতে গিয়ে পড়েছিলাম এক বিয়েবাড়িতে। সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য, দুই-ই বলা চলে। নিকট আত্মীয়ের বিয়ে, ফলে প্রায় সারাদিন পেরিয়েও রাত পর্যন্ত সেখানে বসে থাকা। থাকতে থাকতে অদ্ভুত একটা অনুভূতি হল। 'সংবাদ প্রতিদিন'-এর পাঠকের সঙ্গে তা ভাগ করে নিতে এই লেখা। তবে বলে নেওয়া ভাল, বিষয়টা খুবই স্পর্শকাতর। আশা করি, পাঠক ভুল বুঝবেন না।

বিয়ের বর-কনে উচ্চশিক্ষিত উঠতি প্রফেশনাল। বেসরকারি বহুজাতিকের কর্মী। সঙ্গী-সাথীরাও চকচকে সব ছেলেমেয়ে। ভাল লাগছিল এদের চলন-বলন। তবে প্রথম খটকাটা লাগল বর-কনের সাজ-পোশাকে। সেই একেবারে সেকেলে কায়দা, সেখানে কোনও খুঁত রাখা চলবে না। বিউটি পার্লারের কল্যাণে, জেট-যুগেও বর-কনের কয়েকশো বছরের পুরনো আদল। বিয়ে শুরু হতে অস্বস্তি বাড়তে লাগল। কোনও আচার-সংস্কার বাদ রাখা চলবে না। মন্ত্র কিংবা যজ্ঞে যেন কোনও গাফিলতি না থাকে। আস্তে আস্তে এমন দাঁড়াল, সেকেলে বিয়ে না তথাকথিত জেনারেশন নেক্সট-এর নতুন জীবনের সন্ধান, বুঝে ওঠা যাচ্ছিল না।

'মডার্ন' আর 'ট্রাডিশন'-এর টানাপোড়েনে আঘাত পাওয়ার, ভিতরে ভিতরে ক্ষয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা যে প্রবল... অথচ, সেকেলে কু-আচার ভাঙার সাহস নেই...

চারপাশে বিপুল আয়োজন, নিয়ম-নিষ্ঠ থাকার প্রবল আগ্রহ। বিরাট অপচয়ের চিহ্ন সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। জাঁকজমকে কোনও ঘাটতি নেই। সেকেলেপনায় কোনও ক্লান্তি নেই। ইংরাজি বলিয়ে ছেলেমেয়েদের এসব মেনে নেওয়া দেখে সত্যিই প্রথমটায় অবাক লাগছিল। হঠাৎ মনে হল, আরে, এটাই তো সিনেমায়, টিভি সিরিয়ালে, পত্র-পত্রিকায় দাঁড় করানো আদর্শ জেনারেশন নেক্সট! নব্য প্রজন্মের আদর্শ ছবি! 'ধর্মে আছি-জিরাফেও আছি'। পাঠক ক্ষমা করবেন।

একটা সময় ছিল, যখন সামন্ততান্ত্রিক/জমিদারি রাজত্ব চলত। ছোট ছোট প্রায় বিচ্ছিন্ন গ্রাম নিয়ে গড়ে উঠত এক একটা সমাজ, তার অর্থনীতি-রাজনীতি-সংস্কৃতি ও সামাজিক জীবন। সারা বছর মানুষকে প্রকৃতির সঙ্গে, জমিদারের অত্যাচারের সঙ্গে যুঝতে হত। তার উপর ছিল মড়ক-মহামারী-বন্যা-খরা। সেই দুর্দিনেও বিয়ের অনুষ্ঠানকে ঘিরে গ্রাম-সমাজ মেতে উঠত। উৎসবের আয়োজনে অনাত্মীয়রও নিমন্ত্রণ ছিল। জাত-পাতের কড়াকড়ি থাকলেও অনেক সময়ই নানা অর্থনৈতিক শ্রেণির মানুষ কিছুটা কাছাকাছি আসত। বিয়ে ছিল বৃহত্তর গ্রামীণ সমাজের দু'দিনের জন্য কষ্ট ভুলে থাকার চেষ্টা। তবে সেখানে (কু) সংস্কারের অত্যাচার ছিল প্রবল। মানুষ খানিকটা বাধ্য হয়ে, খানিকটা ভয়ে সেসব মেনে নিত। তার জীবনে তো অন্য কোনও দিশা ছিল না।

আশ্চর্যের বিষয়, আজকের তথাকথিত উচ্চশিক্ষিতরাও সেসব মেনে নিতে দ্বিধান্বিত নয়। কু-আচার, অপচয় এসব নিয়ে তারা যেন মোটেই ভাবিত নয়। ভাবখানা এমন, অন্য জায়গায় বিপ্লব ঘটালেও এক্ষেত্রে তারা তথাকথিত 'ট্রাডিশন' ভাঙতে নারাজ। এটাই নাকি আদর্শ। কিন্তু 'মডার্ন' আর 'ট্রাডিশন'-এর টানাপোড়েনে আঘাত পাওয়ার, ভিতরে ভিতরে ক্ষয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা যে প্রবল।

প্রাচীন সমাজে যেটুকু সামাজিক যোগাযোগের সুযোগ ছিল, অনাত্মীয়কে আপন করার চেষ্টা ছিল, সার্বিক জীবন থেকে সেসব ক্রমশ উধাও হতে বসেছে। যৌথ পরিবার ভাঙছে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপের মতো বাঁচছে একক পরিবার। মানুষ ভাঙতে ভাঙতে একা হয়ে পড়ছে একেবারে। তবে কেন এই অপচয়, বহিরঙ্গের চাকচিক্য? জাঁকজমকের আড়ালে একক স্বার্থপর ব্যক্তি মানুষকে লুকিয়ে রাখার চেষ্টা? ব্যক্তিতান্ত্রিক সমাজের চোরাস্রোত; অথচ, সেকেলে কু-আচার ভাঙার সাহস নেই। কেন এমন হবে?

যে পেশাদাররা ভুখা মানুষের মিছিল দেখলে নাক সিঁটকে বলেন, শহরে জ্যাম হচ্ছে, কর্মসংস্কৃতি নষ্ট হচ্ছে, যত্তোসব ফাঁকিবাজি। বন্‌ধ ডাকলে যাঁরা সল্টলেক সেক্টর ফাইভকে তার বাইরে রাখার পক্ষে সওয়াল করেন, যেভাবে হোক অফিসে পৌঁছনো পবিত্র কর্তব্য মনে করেন, তাঁরা কীভাবে সময়ের এমন অপচয় সহ্য করেন, বুঝতে পারি না। বিয়ের অছিলায় একটু হয়তো মুক্তির চেষ্টা। কিন্তু এভাবে কি সত্যিই মুক্তি আসে! বছরের পর বছর ইঁদুর-দৌড় কি এত সহজে ভুলে যাওয়া যায়।

জেনারেশন নেক্সটকে সত্যিকার মুক্তির কথা ভাবতে হবে। কু-আচারের মোড়ক নয়, স্বাধীন মনন-সুস্থ জীবনের উপর ভিত্তি করে এক নতুন সামাজিকতা নির্মাণ করতে হবে। নাইট ক্লাব, ডিস্কোথেক, মল-কালচার-এর সামাজিক অপচয় থেকে অনেক দূরে তাকে যেতে হবে।

বিয়ের অনুষ্ঠানটিকে যদি স্মরণীয় করে রাখতে হয়, তাকে যদি সত্যি সামাজিক করে তুলতে হয়, তবে জাঁকজমকের সবরকম অপচয়ের উল্টোদিকে এমন কিছু করুন যাতে বৃহত্তর সমাজের উপকার হয়। এ মরসুমের এক-একটা বিয়ে হয়ে উঠুক এক-একটা বানভাসি পরিবারের একটু বেঁচে থাকার আশ্বাস। চেষ্টা করলে মানুষ কী না পারে!

সার্বিক আর্থ-সামাজিক পরিকল্পনা তৈরির সদিচ্ছা প্রয়োজন

সৌম্য চক্রবর্তী

বেসরকারি বড় পুঁজির উদ্যোগে শিল্পায়ন করার যে ধুম পড়েছে তার পিছনে একটা নেতিবাচক যুক্তি হল, সরকারি শিল্প যথেষ্ট দক্ষ নয়। সরকারি অফিস কিংবা কারখানা মানেই নাকি সামাজিক অপচয়। অভিযোগ, সেখানে কর্মীদের মনোযোগ নেই। তা ছাড়া সরকারি এমন কিছু ক্ষেত্র আছে, সেগুলি আমলাতান্ত্রিকতা আর দুর্নীতির আখড়া। তাই বেসরকারি বৃহৎ পুঁজির শরণাপন্ন হওয়া। কিন্তু প্রশাসন তো আর ডকে তুলে দেওয়া যায় না। তাই 'ডু-ইট-নাউ" স্লোগান। ধারণাটা অনেকটা এমন, জং ধরে যাওয়া সরকারি প্রতিষ্ঠানে পরিবর্তনের হাওয়া আসবে। স্লোগানেই সব ক্লান্তি ঝেড়ে সরকারি অফিস - কলেজ - বিশ্ববিদ্যালয় - হাসপাতাল - কারখানা নতুন কাজে মেতে উঠবে।

কিন্তু এটা কি বড্ড বেশি চাওয়া হলে গেল না! 'ডু-ইট-নাউ' তো বটে, কিন্তু করবেটা কে, চারপাশে ক্ষুদ্র ব্যক্তিস্বার্থ-কেন্দ্রিকতা, অথচ সরকারি কর্মীরা নাকি সমাজের জন্য বলিপ্রদত্ত। বৃহত্তর সমাজের জন্য ভাবনাটা নাকি তাদেরই ভাবতে হবে। কেন? কীসের জন্য এই ভাবনা?

বেসরকারি উদ্যোগের দৈত্যাকার কোম্পানির মালিক কিংবা ম্যানেজার মুনাফার পাহাড় গড়বে শ্রমিক (এমনকী ভোক্তা)-কে শোষণ করে, আর সেখানকার কর্মীরা ইঁদুর দৌড়ে নামবে স্রেফ আরও বেশি আয়, আরও বেশি ব্যক্তিগত স্বাচ্ছন্দের আশায়। সে-সব ক্ষেত্রে সামাজিক দায়বদ্ধতা নেই। কর্পোরেটের সামাজিক দায় সীমাবদ্ধ থাকবে ইতি-উতি 'ডোনেশান'-এ (সেটাই তো স্বাভাবিক); কর্পোরেট কর্মীর নাকি মুক্তি হবে বস্তুতান্ত্রিক ভোগে, আধুনিক পণ্যের ব্যবহারে। অথচ সমাজের যত দায় সরকারি কর্মীর! চারপাশে চলবে ভোগ-সর্বস্বতা, ব্যক্তি-কেন্দ্রিকতার নিয়ম, যার জামা-জুতো-মোবাইল-গাড়ি দামি তারই কদর; আর সরকারি কর্মী কৃচ্ছসাধন করবে, তা হয় না।

ঠিক সেই কারণেই দিশাহীন সরকারি কর্মীর ভিতরে জন্ম নিতেই পারে নানারকম অসুখ, সামাজিক ব্যাধি। ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করতে উচ্চপদাধিকারী ক্ষমতাবান কর্মী হয়ে উঠতে পারে আমলাতান্ত্রিক। সেখানে যেন ব্যক্তির আত্মপরিচয় প্রতিষ্ঠিত হয় ক্ষমতা আস্বাদনের মধ্যে দিয়ে। অন্যদিকে ব্যক্তিগত ভোগ-সর্বস্বতার লোভ চরিতার্থ করতে ব্যক্তি-মানুষ দুর্নীতির আশ্রয় নিতে পারে। আর যার এই দুই-এর সুযোগ বা স্পৃহা নেই, সে হয়ে পড়তে পারে নিতান্তই 'ফাঁকিবাজ', নিস্পৃহ।

আর হবে না-ই বা কেন। যেখানে ব্যক্তির কোনও ধরনের মুক্তির আশ্বাস সামাজিক স্তরে নেই, সেখানে সামাজিক হয়ে লাভ কী। সমাজ মানে তো শুধু পরিবার, কিংবা কোনও 'পার্টির' বশংবদ হয়ে চলা। বৃহত্তর সমাজের থেকে সরকারি কর্মী-শিক্ষক-ডাক্তার-শ্রমিক তো কবেই বিযুক্ত হয়ে গিয়েছে। আর আমাদের এই রাজ্যে তো তার একমাত্র দায় নাকি চলতি সরকারকে বছরের পর বছর, দশকের-পর-দশক টিকিয়ে রাখা। কিন্তু কেন? সেই উত্তরটাই গত তিন দশকে সম্ভবত গুলিয়ে গিয়েছে। এক সময়ের সামাজিক আন্দোলন-সামাজিক দায়বদ্ধতা যে আদর্শকে প্রতিষ্ঠা দিয়েছিল, অসংখ্য মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেছিল নতুন কিছু গড়তে, সে-সব আজ উধাও হয়ে গিয়েছে। তাই সব স্তরেই আজ দিশাহীনতার সমস্যা।

একদিকে যখন চরম দিশাহীনতা-নৈরাশ্য, অন্যদিকে ডেকে আনা হচ্ছে পুঁজি-কেন্দ্রিক বাজারের 'গাজর-লাঠি'— নিয়োগ/বিতাড়ন হাতিয়ার। কাজ করলে পয়সা-পণ্য-প্রতিপত্তি; আর পুঁজির মতে তেমন 'দক্ষ' না হতে পারলেই আবর্জনা হয়ে যাওয়া— অসংগঠিত ক্ষেত্রের মরণপণ লড়াই। বাজারের এই অসুস্থ প্রতিযোগিতার পরিমণ্ডলের বিপরীতে গিয়েই সরকারি কর্মীর সজীব থাকার একমাত্র শর্ত তো তাকে আদর্শগতভাবে উদ্বুদ্ধ করা। তাকে সরকার, পার্টি কিংবা ভোগসর্বস্বতার বাইরে নিয়ে বৃহত্তর সামাজিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত করা। 'মগজ ধোলাই' নয়, বৃহত্তর সামাজিকতাকে খুঁজে নিতে তাকে সাহায্য করা মাত্র। এমন আর্থ-সামাজিক পরিমণ্ডল তৈরি করা, যাতে সরকারি কর্মী তার কাজের প্রাসঙ্গিকতা খুঁজে পায়। একমাত্র তা হলেই সরকারি কর্মীর উদ্যোগ সামাজিকভাবে দক্ষ ও অর্থপূর্ণ হতে পারে। শুধু স্লোগান দিয়ে তা হয় না। প্রয়োজন সার্বিক আর্থ-সামাজিক পরিকল্পনা তৈরির রাজনৈতিক সদিচ্ছা।

গতানুগতিক বাংলা সিনেমা থেকে মানবিক দিকগুলি হারিয়ে গিয়েছে

সৌম্য চক্রবর্তী

গত কয়েকদিন উত্তমকুমার অভিনীত বেশ কয়েকটি সিনেমা আবার দেখার সৌভাগ্য হল। দেখতে দেখতে কিছু কথা মনে আসছিল সেগুলি 'সংবাদ প্রতিদিন'-এর পাঠকের সঙ্গে ভাগ করে নিতে এই লেখা। হয়তো কিছুটা অনধিকার চর্চাই।

প্রথমেই বলা উচিত, প্রায় কোনও রকম প্রথাগত প্রশিক্ষণ ছাড়াই কেউ ওইভাবে একটার পর একটা ছবিতে বিচিত্র সব ভূমিকায় অভিয় করে যেতে পারেন, তা নিজে চোখে না দেখলে বিশ্বাস করাই শক্ত। কত বিচিত্র অনুভূতির প্রকাশ দেখলাম, সাধারণ-অসাধারণ চরিত্রগুলি যেন জীবন্ত হয়ে উঠল স্রেফ অভিনয় গুণে। অনেক ছবিই শুধু অভিনয়ের জোরে উতরে গেল। গল্প বা পরিচালনায় হয়তো তেমন মুন্সিয়ানা নেই, প্রযুক্তিও খুবই সেকেলে, তবু অবসর কাটাতে অনেক ছবিই দেখা বা উপভোগ করা যায়।

নায়ক ছবিতে শর্মিলার মুখোমুখি উত্তমকুমার

দেখতে দেখতে আরও কিছু কথা মনে হল। নিতান্ত পারিবারিক ঘটনাকে কেন্দ্র করে তৈরি ছয়-সাতের দশকের এইসব ছবি এত জনপ্রিয় হল কেন? সিনেমায় বৃহত্তর সমাজের সমস্যা প্রায় অনুপস্থিত। পারিবারিক জটিলতার বাইরে সামজিক টানাপোড়েনের ছবি প্রায় নেই বললেই চলে। মনে হবে, যতটুকু যা সমস্যা তা ব্যক্তিগত বা পারিবারিক স্তরেই, বাইরের সমাজটা যেন সিনেমার মতো সহজ সরল। অথচ, ছয়-সাতের দশক তো একটা উত্তাল সময়। সমস্ত পৃথিবীর-দেশ-আমাদের রাজ্য সর্বত্র ভাঙা-গড়ার খেলা চলছে। যুবসমাজ নতুন স্বপ্নে বিভোর হয়ে ঘর ছাড়ছে। সে সবের কোনও ছাপই তেমনভাবে ওই সিনেমাগুলিতে নেই। নিতান্ত নারী-পুরুষ সম্পর্ক-কেন্দ্রিক বেশিরভাগ সিনেমা। তবু কেন এত জনপ্রিয়তা? সে কি শুধুই অভিনয় গুণে?

অভিনয় নিশ্চয়ই একটা বড় কারণ। তবে তার বাইরেও সম্ভবত আরও কিছু আছে, যা মধ্যবিত্ত বাঙালিকে আকর্ষণ করেছে। নিতান্ত সাদামাঠা সিনেমাগুলিতে ইতি-উতি ছড়িয়ে রয়েছে মানবিকতার দুর্মূল্য কিছু ছবি। মানবতাবাদের কিছু ছোঁয়া এখানে ওখানে খুঁজে পাওয়া যাবে অতি সাধারণ গল্পের মধ্যেও। বিলাস-বৈভবের বিপরীতে মানুষের ব্যক্তিগত সততা, ত্যাগ, মানবিকতা, সহমর্মিতা এগুলিই বড় করে দেখানোর চেষ্টা হয়েছে প্রায় সব সিনেমায়।

কখনও নায়ক নিছক উপকারের নেশায়—এমনকী, অনটনের মধ্যেও বিনা পয়সায় দুঃস্থের চিকিৎসা করেছে, বিপদে-আপদে সহায়, সহযাত্রী হয়েছে, কখনও বা গানের প্রতি দায়বদ্ধতায় বিপুল সম্পত্তি ছেড়ে অন্যের বাড়ির গাড়ি চালিয়েছে। আর এভাবেই বাঙালি মধ্যবিত্তের কাছে উত্তমকুমার একজন 'আইডল' হয়ে উঠেছেন। মৌলিক মূল্যবোধগুলিকে মূর্ত করে তোলাতেই তাঁর মাহাত্ম। সেখানেই তাঁর অভিনয়ের সার্থকতা। অতি সাধারণ মানুষের চরিত্রে মৌলিক গুণগুলির প্রকাশ আমাদের অভিভূত করে। সাধারণ ছোট ছোট মানুষের এইভাবে অ-সাধারণ হয়ে ওঠা আমাদের আকর্ষণ করে।

হয়তো এভাবেই এসেছে সামাজিক সমস্যার ছাপ। বিত্তের দম্ভের তুলনায় সাধারণের নিষ্ঠা ও সততাকে অনেক উপরে স্থান দেওয়া হয়েছে। ছয়-সাতের দশকের সমস্যা- জর্জরিত মধ্যবিত্ত বাঙালি পেয়েছে কিছুটা হালকা হওয়ার অবকাশ। হয়তো তাকে খানিকটা ঠকানোই হয়েছে, বলা হয়েছে ব্যক্তিগত ত্যাগেই মুক্তি। তবু বলব, ওই মানবিক গুণের সমাহারকে প্রাধান্য দেওয়া অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ। বিশ্বযুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে ওইসব সিনেমা খানিকটা আনমনা হওয়ার সুযোগ করে দিয়েছে।

অথচ, আজ যখন আমাদের মধ্যবিত্তের জীবন অনেক সাবলীল হয়েছে—আমরা যখন নাকি বিশ্ব নাগরিক হতে চলেছি, তখনই আমাদের সিনেমায় তথাকথিত দুষ্টের দমন আর শিষ্টের পালনের নামে অবিরাম চলেছে বীভৎস 'ভায়োলেন্স'-এর চর্বিতচর্বণ। উত্তমকুমারের সমসাময়িক সিনেমার সঙ্গে আজকের গতানুগতিক বাংলা সিনেমার বোধহয় এটাই সবচেয়ে বড় তফাত। ভয়ঙ্কর আগ্রাসী ব্যক্তিগত ক্ষমতার কুৎসিত প্রদর্শনী চলছে। দুষ্টের দমনের একমাত্র উপায় যেন ব্যক্তিগত ক্ষমতার অনাবশ্যক প্রতিষ্ঠা: খুনের বদলা খুন, মারের বদলা মার। গতানুগতিক সিনেমা থেকে মানবিক গুণগুলি কোথায় হারিয়ে গিয়েছে।

বিস্মৃত স্বাধীনতা-সংগ্রামী রমেশ আচার্য

সৌম্য চক্রবর্তী

৬০ বছ বিপ্লবীর আত্মত্যাগের সাক্ষী হয়ে আছে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস। স্বাধীনতার লক্ষ্যে যাঁরা সর্বস্ব বিসর্জন দিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে মুষ্টিমেয় মানুষই পাদপ্রদীপের আলোয় এসেছেন। অথচ, বহু বিপ্লবী তাঁদের যোগ্য সম্মান না পাওয়ার হতাশা নিয়ে পৃথিবী থেকে চলে গিয়েছেন। আমরা তাঁদের খবরও রাখি না। এর বাইরেও অনেক নেতা ও কর্মী ছিলেন, যাঁরা আত্মজীবনী লেখেননি, প্রচারের আলোয় আসেননি, কারও কোনও সাহায্য নেননি। নতুন সমাজ গঠনের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছতে না পারার যন্ত্রণা নিয়েই হয়তো জীবন কাটিয়ে দিয়েছেন। এমনই একজন আজীবন প্রতিস্পর্ধী মানুষ ছিলেন রমেশচন্দ্র আচার্য।

রমেশ আচার্যর জন্ম ১৮৮৭ সালে। প্রথম জীবনে ছিলেন বিপ্লবীদের অন্যতম সংগঠন অনুশীলন সমিতির প্রথম সারির নেতা, আর প্রথম বিশ্বযুদ্ধ- পরবর্তী সময়ে অন্যান্য বেশ কিছু নেতৃস্থানীয় বিপ্লবীর মতো তিনিও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের লক্ষ্য নিয়েই স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশ নেন। এই পথের পথিক হিসাবে একদিকে যেমন তিনি কংগ্রেসের যুব সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেছেন, অনুশীলন সমিতির ভারপ্রাপ্ত প্রতিনিধি হিসাবে চিত্তরঞ্জন দাস ও সুভাষচন্দ্র বসুর সঙ্গে সাংগঠনিক ও তাত্ত্বিক বিতর্কে লিপ্ত হয়েছেন, আবার বিপ্লবী সমাজতান্ত্রিক পথে চলতে বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী দলের (আরএসপি) অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা হিসাবেও দায়িত্ব পালন করেছেন।

রমেশবাবু ব্রিটিশ-বিরোধী কার্যকলাপের জন্য মোট ২৫ বছর জেলে ছিলেন। সারা ভারতের নানা কারাগারে তাঁকে রাখা হয়। পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের বাইরেও তাঁকে মধ্যপ্রদেশ, তামিলনাড়ু ও কেরলের জেলে দীর্ঘকাল কাটাতে হয়েছে। ১৯৩০-এর দশকে তাঁর স্বাস্থ্যের অবনতি হওয়ায় বিপ্লবীদের তরফ থেকে তাঁর মুক্তির আবেদন করা হলে, ব্রিটিশ সরকার তাঁর বিরুদ্ধে আদালতে গিয়েছিল। আদালতে ব্রিটিশ প্রতিনিধি সওয়াল করতে গিয়ে বলেছিলেন, এই ব্যক্তি অত্যন্ত বিপজ্জনক। এমনকী, বঙ্গোপসাগরের মাঝখানে ছেড়ে দিলেও তিনি নাকি পার্টি তৈরি করে ফেলবেন। রমেশবাবুর সাংগঠনিক ক্ষমতা ছিল প্রবাদের মতোই। আবার, একই সঙ্গে তিনি ছিলেন সংগঠনের অন্যতম তাত্ত্বিক নেতা। ইংরাজি, ফরাসি, হিন্দি, উর্দু, তামিল, মালয়ালাম, গুরুমুখী, এমনকী লাতিন ভাষাতেও তাঁর ব্যুৎপত্তি ছিল। আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ এই ভাষা নিয়েই। সংসদের বাংলা অভিধানের উপদেষ্টামণ্ডলীর তিনি একজন।

ব্রিটিশদের দারুণ অত্যাচারে তাঁর শরীর ভেঙে গিয়েছিল। ১৯৩০-এর পর থেকে ১৯৬৫-তে মৃত্যুর আগে পর্যন্ত তিনি কখনও পেটভরে খেতে পারতেন না, এতটাই ছিল শারীরিক অসুস্থতা। কিন্তু মৃত্যুর আগে পর্যন্ত তিনি ছিলেন মানসিক ও শারীরিকভাবে অত্যন্ত কর্মঠ ও কষ্টসহিষ্ণু। স্বাধীনতার পরেও নানা শারীরিক সমস্যা সত্ত্বেও গোটা দেশজুড়ে তিনি সংগঠনের কাজ করে গিয়েছেন।

রমেশচন্দ্র আচার্য কখনও কারও কাছে অনাবশ্যক কোনও সাহায্য নেননি। সরল জীবন। সংসার নেই। আত্মীয় ও বন্ধু-সহযোদ্ধাদের নিয়েই তাঁর সংসার। কোনও শখ-শৌখিনতা নেই। শুধু পরার্থে আত্মীয় ও বন্ধু-সহযোদ্ধাদের পাশে দাঁড়ানো। তবে যদি বুঝতেন, কেউ তাঁকে করুণা করছেন বা কৃপার পাত্র বলে মনে করছেন, তার কাছে আর দ্বিতীয়বার তিনি আসতেন না। তাঁর আত্মসম্মানবোধ ছিল গগনচুম্বী। দারুণ দৃঢ় তাঁর চরিত্র। সরকারি আর্থিক সাহায্য বা স্বাধীনতা সংগ্রামীর পেনশন নেননি, তাম্রপত্র প্রত্যাখ্যান করেছেন। প্রচারের আলো থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছিলেন। কোনও ধরনের আপস তিনি করেননি। নিদারুণ দারিদ্র, অথচ কোনও সরকারি আনুকূল্য, যা তিনি সহজেই পেতে পারতেন —নেননি।

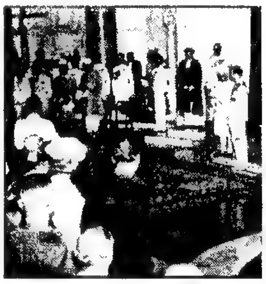

১৫ আগস্ট, ১৯৪৭। মাউন্টব্যা
নিচ্ছেন নেহেরু। পিছনে সিংহাস

আজীবন মহাত্মা গান্ধীর পথের সমালোচক, অথচ কী আশ্চর্য, গান্ধী সম্পর্কে কোনও ব্যক্তিগত কটূক্তি তিনি সহ্য করতেন না। অনুশীলন সমিতির প্রথম দিককার সদস্য হওয়া সত্ত্বেও ধর্মাচারের তিনি ছিলেন বিরোধী। আর সবচেয়ে আশ্চর্যের, তাঁরই সম্পর্কের এক দাদা রাজসাক্ষী হওয়ায় তাঁর দীর্ঘ বন্দি-জীবন, অথচ জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর সেই দাদার সম্পর্কেও কোনও ব্যক্তিগত শত্রুতা তিনি কখনও প্রশ্রয় দেননি। নীরব প্রতিবাদ রেখে গিয়েছেন। ব্রিটিশ সরকার ব্যতীত তাঁর দ্বিতীয় কোনও শত্রু ছিল না।

ও বড়জোড়া থেকে প্রকাশিত । কলকাতা : প্রতিদিন প্রকাশনী লিমিটেডের পক্ষে সৃঞ্জয় বোস কর্তৃক বি এল পাব্লিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ২০ প্রফুল্ল স
ক্ষে সৃঞ্জয় বোস কর্তৃক দর্পণ পাব্লিকেশনস প্রাঃ লিঃ, ৩ মাইল, সেবক রোড, শিলিগুড়ি ৭৩৪০০৮ থেকে মুদ্রিত ও সিটি প্লাজা কমপ্লেক্স, ৩য় তল, সেবক রোড,
কাশনী লিমিটেডের পক্ষে সৃঞ্জয় বোস কর্তৃক প্রত্যহ নিউজ সার্ভিস প্রাইভেট লিমিটেড, ভিলেজ : ঘুটগড়িয়া, পোঃ অঃ : বড়জোড়া, মৌজা : কাদাশোল, জেল
email : pratidin @cal2.vsnl.net.in Regd. No. WBBEN 53080/92, Post Regd. No. WB/CC
lished Simultaneously from Kolkata, Siliguri & Barjora. **Kolkata : Printed & Published by Srinjoy Bose on behalf of Pratidin Prakash**
l **From : Siliguri :** Printed by **Srinjoy Bose** on behalf of Pratidin Prakashani Ltd. at Darpan Publications Pvt. Ltd, 3rd mile, Sevak
& Published by **Srinjoy Bose** on behalf of Pratidin Prakashani Ltd. at Pratyaha News Service Pvt. Ltd., **Vill. :** Ghutgaria, P.O. : Ba
e.mail pratidin @cal2.vsnl.net.in Regd. No. WBBEN 53080/92, Post Regd. No. WB/CC

ব্রিটিশ মডেলের উন্নয়নে ঠাঁই হয়নি সব মানুষের

সৌম্য চক্রবর্তী

রাজ্যে শিল্পায়ন কেন দরকার, সেই শিল্পায়নের চরিত্র কী হবে, কোথায় হবে শিল্প, কৃষির সঙ্গে সেই শিল্পায়ন প্রক্রিয়ার সম্পর্কই বা কেমন হওয়া উচিত—এসব বোঝাতে বারে বারে ইংল্যান্ডের শিল্প

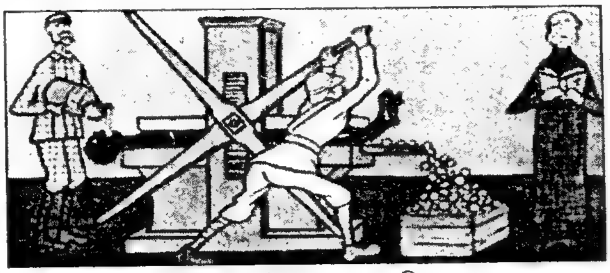

ব্রিটেনের শিল্পায়নকে ব্যঙ্গ করে উনবিংশ শতকের এক জার্মান পত্রিকার ব্যঙ্গচিত্র

বিপ্লবের উদাহরণ দেওয়া হচ্ছে। ইংল্যান্ডে এই এই হয়েছিল, অতএব আমাদেরও তাই-ই তাই-ই করতে হবে। এই একপেশে দৃষ্টিভঙ্গি সরাসরি কতকগুলো প্রশ্ন হাজির করছেই : এটা কে বলে দিল, ইংল্যান্ডের পথে চলা মানেই মোক্ষ লাভ—ওই পথই একমাত্র উন্নয়ন মডেল—সেখানে যেন কোনও গলদ নেই; কিংবা আমরা এতটা নিশ্চিত হলাম কীভাবে যে ওই পথে ইংল্যান্ডের অর্থনৈতিক বৃদ্ধি এসেছে বলেই আমাদের তাই-ই হবে। আর সবচেয়ে বড় কথা, ২৫০ বছর আগের পৃথিবী আর আজকের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল তো কখনওই এক নয়। ইংল্যান্ডের এই সময়ের ইতিহাস আর আমাদের ইতিহাস তো প্রায় পুরোটাই বিপরীতধর্মী। আমরা কি তা হলে সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়নের স্বপ্ন দেখব!

আমরা ভুলব কী করে যে উন্নয়ন মডেল বা তথাকথিত যে উন্নত অর্থনৈতিক কাঠামোর পিছনে আমরা দৌড়চ্ছি, তার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে শোষণের ইতিহাস। দেশের ভিতরে দেশীয় পুঁজির শোষণ আর বাইরে সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির আগ্রাসন। ইংল্যান্ডের শিল্প বিপ্লবের রক্তাক্ত ইতিহাস আমরা ভুলি কী করে! চারণভূমি থেকে, চাষের জমি থেকে, অসংখ্য ক্ষুদ্র শিল্পোদ্যোগী থেকে লক্ষ লক্ষ মানুষকে উৎখাত করেই এসেছিল পুঁজিবাদী শিল্পায়ন। দেশের মানুষ বলে এতটুকু রেয়াত করা হয়নি। অথচ আমরা রাজ্য সরকারের পক্ষে সওয়াল করার তাগিদে, এমনকী সেই অন্যায়-অত্যাচার এর পথকে মডেল বানাতে উঠে পড়ে লেগেছি। যুক্তিটা এমন, অনেক মানুষের দীর্ঘকালীন উন্নতি হতে গেলে কিছু মানুষকে (উন্নয়নের) যূপকাষ্ঠে বলি হতেই হবে। এটাই নাকি 'মডেল'। অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংল্যান্ডে এসব ধান্দা চলতে পারে, তাই বলে একবিংশ শতাব্দীর বামপন্থী বঙ্গেও তা চলবে! বিশেষ করে আর্থ-সামাজিকভাবে দুর্বলতর মানুষের সক্ষমতা আর স্বাধীনতার গুণগান করা পণ্ডিতেরা যখন এইসব অদ্ভুত যুক্তি দেন, তখন সত্যিই অবাক লাগে।

ইংল্যান্ডের এই তথাকথিত উন্নতির গল্প শুধু তো নিজের দেশের ভিতরেরই রক্তাক্ত ইতিহাস নয়, এই মডেল তৈরি হয়েছে পৃথিবীব্যাপী আগ্রাসনের উপর নির্ভর করে। আমরা তো জানি, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে সূর্য অস্ত যেত না। পৃথিবীর সম্পদের এক সুবিপুল অংশ শোষণ করে এগিয়েছে শিল্প বিপ্লব। শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল, শ্রমিকের জন্য বিপুল পরিমাণ খাদ্যশস্য, এসব ইংল্যান্ড পেয়েছিল বাকি বিশ্বকে শোষণ করে। এই বাংলাই তো ছিল তার একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ উৎস। দেশের ভিতরের কাঁচামাল, বিশেষত খাদ্যশস্যের ভাণ্ডারে কুলিয়ে ওঠা যায়নি, বিপুল পরিমাণ সম্পদ সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের মাধ্যমে জোগাড় করতে হয়েছিল। আমাদের রাজ্যের সে-সুযোগ কোথায়! রাজ্যের প্রাকৃতিক সম্পদকে ছিবড়ে করে ফেলা ছাড়া অন্য পথ খোলা থাকছে কী!

উল্টোদিকে, ইংল্যান্ডকে সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন চালিয়ে নিজের শিল্পপণ্য বিক্রির বাজার তৈরি করতে হয়েছিল। মুক্ত বাণিজ্যের নামে অন্য স্বাধীন দেশগুলোর স্বাধীন শিল্পোদ্যোগকে ধ্বংস করেই তা গড়ে উঠেছিল। অন্য দেশের পণ্য উৎপাদন প্রক্রিয়া আর তার সঙ্গে যুক্ত বিপুল সংখ্যক মানুষকে নিশ্চিহ্ন করে সেই শূন্যতা পূরণ করতে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল ব্রিটিশ পণ্য। ব্রিটিশ পণ্যের বাজার তৈরি করতে, এছাড়াও নানারকম অসম যুক্তিতে বাধ্য করা হয়েছিল বিভিন্ন স্বাধীন রাষ্ট্রকে। একদিকে সম্পদ আহরণের তাগিদ, অন্যদিকে বাজার তৈরির প্রচেষ্টা, তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই অধিকৃত ভূখণ্ডের আর্থ-সামাজিক-প্রশাসনিক কাঠামো বদলে নেওয়া হয়েছিল। ছোট ইংল্যান্ডের শিল্প বিপ্লবের তাগিদে বাকি দুনিয়াটাকেই চিরতরে বদলে দেওয়া হয়েছিল। সেটা কী কখনও আমাদের মডেল হতে পারে। সেটা আজকের পৃথিবীতে শুধু অসম্ভবই নয়, তা কখনও কোনও সভ্য সমাজ মেনেও নিতে পারে না।

ঘরে-বাইরে এত শোষণ, এত অত্যাচার, এত সম্পদ আহরণ ও বিনিয়োগ করেও ইংল্যান্ডের শিল্পায়ন কি সে দেশেরই সমস্ত মানুষকে শিল্পায়নের গণ্ডিতে জায়গা দিতে পেরেছিল? সম্ভবত না। আমরা ভুলে গিয়েছি, লক্ষ লক্ষ ব্রিটিশ নাগরিক দেশান্তরিত হয়েছিল উত্তর আমেরিকা, আফ্রিকা আর অস্ট্রেলিয়ায়। উত্তর আমেরিকা আর অস্ট্রেলিয়া—দু'দুটো মহাদেশের নিজস্ব জনগোষ্ঠীকে প্রায় সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন করে ফেলেছিল দেশান্তরী ব্রিটিশরা।

শিল্প বিপ্লবের ধাক্কায় উৎখাত হওয়া বিপুল জনসংখ্যা তিন-তিনটে মহাদেশে ছড়িয়ে পড়তে বাধ্য হয়েছিল। শিল্প বিপ্লবের গণ্ডিতে ইংল্যান্ড তার নিজের দেশের সব মানুষকেই জায়গা দিতে পারেনি। শিল্প বিপ্লব সারা পৃথিবী থেকে সম্পদ ছিনিয়ে নিয়েও, সারা পৃথিবীকে বাজার বানিয়েও দেশের সবাইকে তার গর্ভে স্থান দিতে পারেনি। অথচ আমরা বলছি, একবিংশ শতাব্দীর নিয়োগবিহীন পুঁজি নাকি সবাইকে চাকরি দেবে—সিঙ্গুরের অনথিভুক্ত বর্গাদার কিংবা খেতমজুর শিল্পায়নের হাওয়ায় উন্নয়নের মুখ দেখবে। একে মিথ্যাচার ছাড়া আর কীই বা বলা যায়!

১০০ দিনের কাজে নেই বামপন্থী বা মানবিক মুখ

সৌম্য চক্রবর্তী

কংগ্রেস ও বাম জোটের অভিন্ন ন্যূনতম কর্মসূচির অন্যতম বিষয় হিসেবে এসেছে ১০০ দিনের কাজের প্রকল্প। এ-রাজ্যেও কয়েকটি জেলায় প্রকল্পের কাজ চলছে। সারা দেশজুড়ে সমস্ত জেলায় এই প্রকল্প রূপায়ণ করা হবে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে এ-টি একটি 'বামপন্থী' পদক্ষেপ। 'আম আদমির' পাশে দাঁড়ানোর ঐকান্তিক চেষ্টা। সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়নের যুগে, যখন সরকারের ভূমিকাকে ক্রমশ কমিয়ে আনা হচ্ছে — সরকার যখন শুধুই নিয়ামক, তখন সম্পূর্ণ সরকারি খরচে, সরকারি তত্ত্বাবধানে এই রকম বিরাট প্রকল্পে নামা সত্যিই ব্যতিক্রমী মনে হতে পারে। কিন্তু আসল কথাটা হল, এটাই বিশ্বায়নের পথ। সরকারের এই পদক্ষেপ আসলে নব্য-সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়নের যে সার্বিক পরিকল্পনা তার অন্তর্গতই— বাইরের কিছু নয়। বিশ্বব্যাঙ্কের উন্নয়ন ভাবনার সঙ্গে তা সামঞ্জস্যপূর্ণ। এখানে বামপন্থা খুঁজতে যাওয়া ভুল হবে। কিংবা সাম্রাজ্যবাদী 'বিশ্বায়নের মানবিক মুখ' হিসেবে চালিয়ে দেওয়ার যত চেষ্টাই হোক না কেন, এর উদ্দেশ্যটা অন্য। তাৎক্ষণিকভাবে মানুষ উপকৃত হবে হয়ত; কিন্তু এর পিছনে যে দীর্ঘমেয়াদী ভাবনা কাজ করছে তা কতটা মানবিক কিংবা বামপন্থী তা নিয়ে প্রশ্ন তোলা উচিত।

গত শতাব্দীর মাঝামাঝি ভারত ও কিছু দেশ স্বাধীন হলে সে-সব দেশের উন্নয়ন ছিল মুখ্য চিন্তা। একদিকে সোভিয়েতের পথ বা একটু অন্যরকম চিনের পথ, অন্যদিকে ছিল পুঁজিবাদী দুনিয়ার পথ। একটা জগা-খিচুড়ি পথে আমরা হাঁটতে শুরু করি, জোর ছিল শিল্পায়নে। ভাবা হয়েছিল, শিল্পায়নের জোয়ারে আর্থ-সামাজিক কাঠামোটাই বদলে যাবে, উন্নয়নের বাধাগুলো ভেঙে ফেলা যাবে। সেই শিল্পায়নের কেন্দ্রে ছিল তথাকথিত আধুনিক ভারী শিল্প, যেখানে পুঁজির প্রবল প্রাধান্য। সে ব্যক্তিপুঁজিই হোক বা সরকারি পুঁজি। এই পুঁজি-কেন্দ্রিক শিল্পায়নের সঙ্গেই ছিল সামাজিক সুরক্ষার গল্প। কাজের সুযোগ, সামাজিক নিরাপত্তার গল্প। গল্পটা দরকার ছিল, না হলে এইসব দরিদ্র দেশের দরিদ্র মানুষের মন থেকে সমাজতন্ত্রের 'ভূত'টাকে তাড়ানো যেত না। তবে, এই গল্পের খানিকটা লাগুও হয়েছিল। কিন্তু সামাজিক নিরাপত্তা সত্যিই ছিল। গরিব মানুষের কাছেও কিছুটা স্বাস্থ্য শিক্ষার সুযোগ ছিল।

এল বিশ্বায়নের গল্প। বিশ্বায়িত পুঁজি সারা পৃথিবীজুড়ে দাপিয়ে বেড়ানোর খানিকটা অবাধ ছাড়পত্রই পেয়ে গেল। কিন্তু ইতিহাস থেকে পুঁজিতন্ত্র কিছু গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাও নিল। অর্ধশতাব্দী জুড়ে উন্নয়নের যে প্রক্রিয়া আমাদের মতো অনুন্নত দেশগুলিতে চলেছে তার শিক্ষা হিসেবে এটা বোঝা যাচ্ছিল, পুঁজি-কেন্দ্রিক শিল্পায়নে সংখ্যাগরিষ্ঠ বিশাল সংখ্যক মানুষের কোনও স্থান নেই। 'আধুনিক' শিল্প /পরিষেবা অত্যন্ত পুঁজিনিবিড়, তার নিয়োগ ক্ষমতা খুবই কম। তাই আগে যে ভাবা হয়েছিল শিল্প-পরিষেবার জোয়ার সমস্ত আর্থ-সামাজিক কাঠামোয় ছড়িয়ে পড়ে ব্যাপক পরিবর্তন আনবে — গ্রাম শহরের 'উদ্বৃত্ত মানুষ'দের কাজের সন্ধান দেবে — তা ভুল। বিশ্ব পুঁজির কর্ণধাররা ক্রমশ বুঝতে পারছে এটা সম্ভব নয়। সারা পৃথিবীকে লুণ্ঠন করে ইংল্যান্ড-আমেরিকা-অস্ট্রেলিয়ায় যা কিছুটা সম্ভব হয়েছে, তা অনুন্নত দেশে চলবে না। অনুন্নত বিশ্বের শত শত কোটি মানুষকে পুঁজিবাদ তার উৎপাদন কাঠামোর ভিতরে জায়গা দিতে পারবে না।

কিন্তু বিশাল সংখ্যক মানুষকে অভুক্ত রেখে, দারিদ্র্যে ডুবিয়ে রেখে পুঁজিবাদ তার ডালপালা মেলবে কি করে! তার চাক্‌চিক্য যে প্রতি মুহূর্তে বিপদের সম্মুখীন হবে। এইসব হতভাগ্য মানুষরাই যে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ। এরা যে বিদ্রোহ করবে না, তার গ্যারান্টি কোথায়। যুগযুগান্ত ধরে চলে আসা এইসব 'মাটির মানুষ'দের সম্পদ ছিনিয়ে নিয়েই যে পুঁজি বেড়ে উঠেছে কয়েক শতক জুড়ে! এদেরই জল-জঙ্গল-জমি কেড়ে নিয়ে গড়ে উঠছে পুঁজির পাহাড়! তাই বিশ্বায়িত পুঁজি একদিকে যেমন অপ্রতিরোধ্য হয়ে এগোতে চাইছে! অন্যদিকে, তার ভয় যারা বাইরে পড়ে রইল বা যাদের বাইরে ছুঁড়ে ফেলা হল, তারা পুঁজির আধিপত্যকে চ্যালেঞ্জ করবে না তো! এদেরকে চুপ করিয়ে রাখতেই তাই দরকার ১০০ দিনের কাজ, অসংগঠিত ক্ষেত্রে সামাজিক সুরক্ষা কবচ কিংবা অরণ্যের অধিকার আইন। এ-সবের ফলে, এই সবকিছুর বাইরের মানুষদের খানিকটা তাৎক্ষণিক উপকার হবে ঠিকই। কিন্তু সেই আপাত মানবিক মুখোশটা পেরিয়ে বামপন্থার মুখ খুঁজতে যাওয়া কি ঠিক হবে? বোধহয় না। কারণ, একদিকে যখন চলবে এইসব কর্মসূচি, অন্যদিকে ঠিক তখনই চলতে থাকবে জল-জঙ্গল-জমি ছিনিয়ে নিয়ে সর্দার সরোবর বাঁধ নির্মাণ, সিঙ্গুর—কলিঙ্গনগরের শিল্পায়ন, কিংবা রাজারহাটের নগরায়ন। তাই ১০০ দিনের কাজে কেউ হয়তো মানবিক মুখ দেখতে পাবেন, কিন্তু এই চুপ করিয়ে রাখার কর্মসূচির পিছনে কেউ যদি বামপন্থার খোঁজ পান—তা হয়তো ঠিক হবে না।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এখন শ্রমিক তৈরির কারখানা

সৌম্য চক্রবর্তী

দিন কয়েক আগে মোটামুটি নিয়ম মেনেই পালিত হল শিক্ষক দিবস। ছাত্র-ছাত্রীরা মাস্টারমশাই/দিদিমণিদের উপহার দিল। সরকারিভাবেও কিছু কর্তব্য পালন হল। এখন শিক্ষক দিবসে উপহার মেলে প্রচুর, কিন্তু সে অনুপাতে সম্মান শ্রদ্ধা-মেলে কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতেই পারে। আসলে, এখন পড়াশোনা ব্যাপারটাই বদলে গিয়েছে। শিক্ষক-শিক্ষিকারা এখন 'প্রফেশনাল'; পড়ানো একটা পেশা। আর ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে পড়াশোনা করা মানে কাজের বাজারে বিক্রয়যোগ্য শ্রম উৎপাদন করতে শেখা।

অথচ, আমরা যে-সব মাস্টারমশাই-দিদিমণিদের কাছে পড়াশোনা করেছি, তাঁরা যেন অনেকটাই অন্যরকম ছিলেন। আসলে পড়াশোনার পুরো ব্যাপারটাই অন্যভাবে দেখা হত। সার্বিক জ্ঞান অর্জন, মানুষ হয়ে ওঠা, যে কোনও বিষয় নিষ্ঠাসহ ঠিকভাবে শেখা, কোনওরকম গোঁজামিল না রেখে ভাবতে শেখা—প্রশ্ন করতে শেখা, এ-সব ছিল পড়াশোনার মুখ্য উদ্দেশ্য। তারপরই আসত বিষয় শিক্ষা—বাংলা, ইংরেজি, ইতিহাস, বিজ্ঞান ইত্যাদি। আর উদ্দেশ্যটাই নির্দিষ্ট ছিল বলে বিষয়গুলিও ঠিকঠাক শেখা হত। শিক্ষক-শিক্ষিকারা ধরে ধরে প্রায় প্রতিটি ছাত্র-ছাত্রীর সমস্যা বুঝে পড়াশোনার চেষ্টা করতেন। কেউ যে ফাঁকি দিত না, এমন নয়। তবে তাদের সংখ্যা ছিল হাতে গোনা। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কাছে ছাত্র-ছাত্রীরা শুধু বিষয়েরই তালিম নিত না, তাদের কাছে মাস্টারমশাই-দিদিমণিরা পরিবারের গুরুজনদের মতোই কিংবা তার থেকেও বেশি করে 'আদর্শ মানুষ' হয়ে উঠতেন। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের জীবন, দৃষ্টিভঙ্গি, সততা, নিষ্ঠাই ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্বুদ্ধ করত। সেই উদ্বুদ্ধ করার মধ্যে যে অনাবিল আনন্দ তা-ই শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মূল পাথেয় ছিল। কারণ, টাকার অঙ্কে তাঁদের প্রাপ্তি হত খুবই সামান্য। আর এটাই ছিল সবচেয়ে আশ্চর্যের। আজ থেকে দু-তিন দশক কিংবা তারও আগে যাঁরা শিক্ষকতা করেছেন তাঁদের অর্থাগম হত অল্পই। কিন্তু কী দারুণ নিষ্ঠা নিয়ে তাঁরা ছাত্র-ছাত্রীদের মানুষ করে তুলতেন।

অথচ এখন শিক্ষক-শিক্ষিকাদের আর্থিক অবস্থা তুলনায় অনেক ভাল, কিন্তু দরদের যেন বড় অভাব। তাঁরা হয়তো এখন অনেক বেশি 'প্রফেশনাল'—কাজের মানুষ তৈরিতে পটু। কিন্তু সেকালের সেই স্নেহ, সেই মনযোগ বুঝি আর পাওয়া যাচ্ছে না। তাই ছাত্র-ছাত্রীরাও মানুষ হয়ে ওঠার বদলে শুধুই কর্মক্ষম বাজার-চলতি 'যন্ত্র' হয়ে উঠছে। কিন্তু মাস্টারমশাই-দিদিমণিদের দোষ দিই কীভাবে? আসলে তো পুরো শিক্ষাব্যবস্থাটাই বদলে যাচ্ছে; দৃষ্টিভঙ্গিটাই পাল্টে গিয়েছে। সবসময় শেখানো হচ্ছে মানুষ হওয়া, সৎ হওয়া, নিষ্ঠাসহ কোনও কিছু শেখা তেমনই জরুরি নয়। বরং দরকার যেন-তেন-প্রকারেণ কার্যোদ্ধার করা। বলা হচ্ছে, সেই ছাত্রই বেশি বুদ্ধিমান, যে মাস্টারমশাইকে ফাঁকি দিয়ে কাজটা সেরে ফেলতে পারে। আর এর সঙ্গে খাপ খাওয়াতে শিক্ষক-শিক্ষিকাদেরও বদলাতে হচ্ছে। যাঁরা ছিলেন মানুষ গড়ার কারিগর, এখন তাঁরাই দক্ষ-শ্রমিক তৈরির কুশলী প্রশিক্ষক হয়ে উঠছেন। তাঁদের কাজ এমন পণ্য তৈরি করা, যা শ্রমের বাজারে বহু দামে বিক্রি হবে। তবেই শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কদর। এখন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আর 'মন্দির' নয়, সেখানে বিদ্যার 'আরাধনা' হয় না। বরং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হল দক্ষ শ্রমিক তৈরির কারখানা। সেই কারখানায় শিশু-কিশোর-যুবক-যুবতীরা কাঁচামাল আর শিক্ষক-শিক্ষিকারা শিক্ষা-শ্রমিক তৈরির কারিগর।

এক সময় শেখানো হত শিক্ষক-শিক্ষিকারা সমাজের প্রাণশক্তি। সমাজটাকে ধরে রাখতে, সচল রাখতে এঁদের নিঃস্বার্থ কাজের কথা আমাদের বলা হত। গোটা সমাজটাই শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সেই চোখে দেখত। এঁদের শ্রমকে কখনওই বিক্রয়যোগ্য পণ্য হিসাবে ভাবা হত না। এঁরাও যা পেতেন, তাকে গুরুদক্ষিণা হিসাবেই নিতেন, পারিশ্রমিক হিসাবে নয়। সনাতন ভারতীয় মূল্যবোধ এই সেদিন অবধিও শিক্ষাব্যবস্থাটাকে ধরে রেখেছিল। তাই শিক্ষক-শিক্ষিকাদের শ্রমের প্রতিদান পণ্য-বিনিময়ের নিয়মে স্থির হত না। এঁদের অবস্থান ছিল পণ্যসর্বস্ব অর্থনীতির বাইরে। সমাজের সেই দৃষ্টিভঙ্গি শিক্ষক-শিক্ষিকাদের টিকে থাকার রসদ ছিল—তাঁদের দরদের উৎস ছিল।

আজ সমাজ সেই ভাবনা থেকে সরে এসেছে। এখন শিক্ষা পণ্য, আর শিক্ষক-শিক্ষিকারা সেই পণ্য তৈরির কারিগর। তাই তাঁদের প্রতিদানও ঠিক হয় বাজারের নিয়মে। শিক্ষক-শিক্ষিকারাও তাই 'কাজ করছেন' সেই পণ্য বিনিময়ের নিয়ম মেনে : 'ফেলো কড়ি/ মাখো তেল'। শিক্ষক দিবস সেই বিশ্রী নিয়মটাকে একটু ঢেকে দেওয়ার চেষ্টা। কিন্তু তা অক্ষম চেষ্টাই।

মানুষের পরিচয় কি ঠিক করে দেবে পণ্যের বাজার

সৌম্য চক্রবর্তী

শচীন তেণ্ডুলকর একদিনের ক্রিকেটের জন্য নির্বাচিত জাতীয় দলের অধিনায়ক হতে চাননি। অনেকেই এই সিদ্ধান্তে আশাহত। কেউ কেউ চটেছেন; শচীন নাকি শুধুই নিজের দিকটা দেখছেন, দেশের কথা ভাবছেন না। আসলে, নিজের খেলোয়াড় জীবনটাকে বাঁচাতে তাঁর এই সিদ্ধান্ত। তিনি আর রোবটের মতো পৃথিবীর এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত প্রতিটা ম্যাচে খেলে যেতে চাইছেন না। এতে যে খুব তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে যাচ্ছেন, তা তিনি বিলক্ষণ বুঝছেন। সেই ফুরিয়ে যাওয়ায় তাঁর ক্ষতি। তবে, সবচেয়ে বেশি ক্ষতি ক্রিকেট খেলাটার। আর, খেলার ক্ষতি মানে একটা জাতির গড়ে ওঠার পথ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া। শচীনকে তাঁর খেলোয়াড়োচিত মনোভাবের জন্য অসংখ্য সেলাম। ক্রিকেট বোর্ড, এমনকী তাঁর দেশের কর্তাব্যক্তিরা ক্রিকেটটাকে অর্থোপার্জনের যন্ত্র হিসাবে দেখতে শুরু করলেও তিনি যে এখনও খেলাটাকে খেলা হিসাবে মর্যাদা দেন তা জেনে সত্যিই খুব ভাল লাগল।

ক্রিকেট এখন স্পনসরদের ব্যবসা করার হাতিয়ার। আর তাই খেলাটাকে ক্রমশ 'আকর্ষণীয়' করে তোলার অজুহাতে নিত্য-নতুন পদ্ধতি আমদানি করা হচ্ছে। তেমনই একটা 'আবিষ্কার' হল 'টোয়েন্টি-২০' ক্রিকেট। যুগ এখন কেবল নাকি দৌড়চ্ছে; রোজই নাকি বদলাচ্ছে। তাই খেলাটাকেও বিশ্রীভাবে দৌড়তে হবে— যুগোপযোগী হতে হবে। আর আধুনিক হওয়া মানে তো আরও বেশি 'বাজারমুখী' হওয়া। টেস্ট ক্রিকেট দেখার ধৈর্যটাই হারিয়ে যাচ্ছে; তাই সেখানে মুনাফা নেই। ফলে, খেলাটার সৌন্দর্যের সর্বনাশ করে এসেছে একদিন চটজলদি উত্তেজনা-উত্তাপ পাওয়ার ক্রিকেট। এখন আবার তাতেও সাধ মিটছে না। এসেছে টোয়েন্টি-২০ ক্রিকেট। কিন্তু ক্রিকেট খেলার মূল শৈলী অধ্যবসায় 'ধাঁই-ধপধপ্' ক্রিকেটের ঠেলায় যে চুলোয় যাচ্ছে তাতে মনে হয় কারও কিছু বলার নেই। ভাবখানা এমন, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সবই তো বদলাবে। বদল ভাল, কিন্তু কোনদিকে— আগে না পিছে— সেটা ভাবা দরকার নয় কি!

এ-মুহূর্তে আমাদের সাধের মহানগরীতে সংস্কৃতির পীঠস্থানে টেনিস উৎসব চলছে। কিন্তু মাঝে মাঝে যেন ভুল হচ্ছে, লন-টেনিস খেলার জন্য তারকারা এসেছেন, না ফ্যাশন শো করতে। আসলে, এখন খেলা আর ফ্যাশন শো— দুটোর উদ্দেশ্যই এক। স্পনসরদের বাজার বাড়ানো। মুনাফা তৈরির পথ প্রশস্ত করা। যে খেলার বাজার আছে, কিংবা বলা ভাল যে খেলাটাকে বাজারমুখী করে তোলা যাচ্ছে স্পনসরদের পৃষ্ঠপোষকতা কেবল সেখানে। তাই লন টেনিস নিয়ে মাতামাতি তৈরি হলেও, খেলার রাজা (আদি-খেলা) অ্যাথলেটিক্স এখন ব্রাত্য।

দুর্জনেরা (!) বলে, খেলা বিষয়টাকেই নাকি ঢেলে সাজানো হচ্ছে, যাতে তার সঙ্গে যুক্ত উদ্দীপনা-উৎসাহকে ব্যবহার করে পণ্যের বিক্রি বাড়ানো যায়। মুনাফার পাহাড় তৈরি করা যায়। মানুষের মনের গভীরতম জায়গায় পণ্য সর্বস্বভাবে পৌঁছে দেওয়া যায়। খেলা আর পণ্য তাই একাকার হয়ে গিয়েছে। এতে স্পনসরদের পৌষমাস, চতাৎক্ষণিক চটজলদি উদ্দীপনায় অবগাহন করে লাখো-কোটি মানুষের দৈনন্দিন জীবনের দুঃখ ভুলে থাকার চেষ্টা, খেলোয়াড়দেরও লক্ষ্মীলাভ। সবই ভাল, শুধু ক্ষতিটা খেলার। শতশত বছরের নিষ্ঠায় তৈরি হওয়া শৈলীর সর্বনাশ। আর খেলার ক্ষতি মানে জাতির গড়ে ওঠার একটা ভিত্তি নষ্ট হয়ে যাওয়া। খেলার মধ্যে দিয়ে যে শরীর ও মনের পরিচ্ছন্নতা, পারস্পরিকতার বোধ, জীবনের হারজিতকে সহজভাবে নিতে পারার ক্ষমতা, কষ্ট-সহিষ্ণুতা তৈরি হয়, সে সুযোগ আমরা হারাব। সেটা অপূরণীয় ক্ষতি। এখন খেলা মানে শুধু ব্যক্তি-ঔৎকর্ষের সদম্ভ প্রতিষ্ঠা; ব্যক্তি-কেন্দ্রিক প্রকাশের আরও একটা ক্ষেত্র। খেলা মানে শুধুই পেশা। সমস্ত কিছুকে বিক্রিযোগ্য পণ্য, মুনাফা তৈরির হাতিয়ার হিসাবে দেখা আসলে এক বিশেষ সংস্কৃতির চর্চা। সবকিছুই পণ্য, এটাই হল সেই বোধের মূল কথা। পণ্যের বাজারে ঔৎকর্ষই হল যে কোনও কিছুর একমাত্র পরিচয়। শুধু কোনও ব্যক্তির সৃষ্টির তুল্যমূল্য বিচারই নয়, এমনকী সেই ব্যক্তির অবস্থানও ঠিক হবে পণ্য বিক্রয়ের প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে। সে-ই সমাজে গুরুত্বপূর্ণ, যার সৃষ্টি চড়া দামে বিক্রয়যোগ্য পণ্য— যার সৃষ্টির বাজার আছে। মানুষের পরিচয় ঠিক করে দেবে কেবল পণ্যের বাজার। বাকি সব অপ্রয়োজনীয়।

কিন্তু মনে রাখা দরকার, এই ভোগসর্বস্ব পণ্যায়ন সর্বগ্রাসী। পণ্য-সংস্কৃতি সমস্ত কিছুকেই মুনাফার হাতিয়ার ভাবে। কিন্তু, মানুষের সূক্ষ্ম অনুভূতি— অসীম ও বিচিত্র সৃষ্টিশীলতাকে একমাত্র পণ্যের মাপকাঠিতে মাপতে যাওয়া শুধু ভুলই নয়, সমাজের পক্ষে মারাত্মক ক্ষতিকারকও বটে। এই পণ্যমুখী দৌড় ব্যক্তি মানুষকেও পণ্য করে তোলে। প্রকৃতি পণ্য, মানুষের দেহ পণ্য, আর সৃষ্টিশীলতা পণ্য, এমনকী চিরন্তন অনুভূতিগুলিও পণ্য। সমস্ত কিছু ভোগ্যবস্তু। এই ভোগসর্বস্বতার ইঁদুর-দৌড়ে আমাদের দম বন্ধ করে দেবে। ভোগসর্বস্বতার ঘোরে আমরা কি মানুষের চিরন্তন 'স্বাধীনতা'র খোঁজ থেকে বিচ্যুত হব!

নিছক ক্ষমতার জন্যই ক্ষমতা, বামপন্থী লক্ষ্য আর নেই

সৌম্য চক্রবর্তী

আমাদের এই রাজ্য এ-মুহূর্তে এক অরাজক পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে চলেছে। সবচেয়ে যেটা দুর্ভাগ্যজনক, এর থেকে বেরনোর কোনও পথ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। গত তিরিশ বছরের আপাতশান্তির মুখোশটা ক্রমশ খসে পড়ছে। ভিতরের কদর্য রূপটা বেরিয়ে আসতে চাইছে হুড়মুড় করে। অবশ্য অনেকেই বলবেন, সারা দেশ এমনকী, সারা পৃথিবীর অবস্থাও তো ক্রমশ জটিল হয়ে উঠছে, রাজ্যের আর দোষ কী। সর্বত্র অস্থিরতা বাড়ছে। কিন্তু এ- রাজ্যের গত তিরিশ বছরের তথাকথিত বামপন্থী শাসনের অভিজ্ঞতার পরিণতি যে এমন হবে, এবং তা এত আকস্মিকভাবে আসবে, তা হয়তো খানিকটা অস্বাভাবিকই।

দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়ায় এ-রাজ্যের মানুষ এখন সর্বত্র মরিয়া হয়ে উঠেছে। অথচ, কোনও দিকনির্দেশ নেই। তাই মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদগুলি দানা বাঁধছে না ঠিকই, কিন্তু বিস্ফোরণগুলিকে অগ্রাহ্য করি কী করে। কেন এমন হল। 'ভুখা মানুষের সরকার'-এর বিরুদ্ধেই দাঁড়িয়ে গেল 'ভুখা মানুষ'। বোধহয় বামপন্থার মুখোশের আড়ালের ব্যবস্থাটাকে মানুষ চিনতে পারছে একটু একটু করে।

সরকারটা যেন সব ব্যাপারে তার গ্রহণযোগ্যতা হারাতে বসেছে। শিল্পায়নের নামে দেশি-বিদেশি দৈত্যাকার পুঁজিকে ডেকে আনা হচ্ছে। শুধু তাই নয়, কী শর্তে সেই পুঁজি আসছে তা সম্পূর্ণ গোপন রাখা হচ্ছে। কেন? তবে কী সে-সব শর্ত জনবিরোধী! শিল্পায়নের নামে বৃহৎ পুঁজির হাতে কি রাজ্যের জল-জঙ্গল-জমি জলের দরে তুলে দেওয়া হচ্ছে? বিনিময়ে আমরা কী পাচ্ছি? কৃষি জমি থেকে উচ্ছেদ করা হচ্ছে হাজার হাজার মানুষকে। আরও লাখ লাখ বে-রোজগার হচ্ছে এই উচ্ছেদের মধ্যে দিয়ে। এর মধ্যে সামান্য অংশই তো পুঁজিবাদী শিল্পের আবর্তে জায়গা পাবে। তা হলে এই উচ্ছেদ কার স্বার্থে! শুধু উচ্ছেদ নয়, উচ্ছেদের বিরোধিতা করায় পুলিশ দিয়ে, ক্যাডার দিয়ে, গুণ্ডা দিয়ে ধর্ষণ-খুন করা হচ্ছে। কার স্বার্থে!

এ তো গেল অর্থনীতির নীতিহীনতার কথা। অন্যদিকে, কোথায় খেলার বোর্ড নির্বাচন হবে, সেখানে সরকারি দলের অনাবশ্যক নাক গলানো এবং অবধারিতভাবে দুর্নীতির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন। সারা রাজ্য জুড়ে রেশনের চাল-গম কোথায় যেন উবে যাচ্ছে। সেখানেও রেশন ডিলার সরকারি দলের ক্যাডার প্রশাসনের অশুভ আঁতাত। কেঁচো খুঁড়তে সাপের মতো বেরিয়ে পড়ছে সর্বগ্রাসী সর্বব্যাপী দুর্নীতির ক্ষয়রোগ। প্রতিটি ক্ষেত্রে সরকারি দলের কুৎসিত যোগাযোগ। এমনকী, মানুষের একান্ত ব্যক্তিগত সম্পর্কেও খবরদারি করতে ছাড়ছে না ক্যাডার বাহিনী আর প্রশাসন। কেন এমন হল! এমন সর্বব্যাপী দুর্নীতি কী তবে হঠাৎ করে জন্ম নিল? নাকি দুর্নীতির ঘুনপোকা ভিতরে ভিতরে সব জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছিল অনেক আগেই?

এই ক্ষয়রোগকে শনাক্ত করতে গেলে, আসলে তিরিশ বছরের শাসনের মূল ভিত্তিটার দিকেই তাকাতে হবে। ক্ষমতায় আসার সময় এই সরকারের ভিত্তি ছিল মূলত ক্ষুদ্র প্রান্তিক চাষি, বর্গাদার, কৃষি শ্রমিক, আর তার বাইরের ভুখা মানুষ, খেটে খাওয়া মানুষ। একটা স্বপ্ন নিয়ে এরা এই সরকারটাকে দাঁড় করিয়েছিল। উল্টোদিকে, সরকারি দল তার বাহিনীকে বুঝিয়েছিল, বিপ্লব যদি নাও আসে, তবুও খেটে-খাওয়া মানুষকে 'রিলিফ' দেওয়ার জন্যই সরকারে থাকা দরকার, সরকারকে টিকিয়ে রাখা দরকার। কেন্দ্রীয় সরকারের 'জুজু'র বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে রাজ্যের সাধারণ মানুষের অধিকার নিশ্চিত করতে সরকারকে টিকিয়ে রাখার মহান কর্তব্য সবাইকে বোঝানো হয়েছিল। অনেকেই তা বুঝেও ছিলেন।

আর সরকারে থাকতে গেলে তো সংগঠনকে সুগঠিত, সংগঠিত করতে হবে। সর্বত্র ছড়িয়ে দিতে হবে। তাই দরকার স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়, সর্বধরনের স্বাস্থ্যকেন্দ্রের পরিচালন বোর্ডে সংগঠনের আধিপত্য। সমস্ত সরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রায় সমস্ত পদে সংগঠনের উপস্থিতি। সব ধরনের সরকারি ব্যবস্থায়-পরিকল্পনায় সংগঠন। গ্রাম-শহরের সমস্ত সংস্থায় সংগঠন। কর্পোরেশন-মিউনিসিপ্যালিটি-পঞ্চায়েত সব দফতরে সংগঠন ছাড়া গতি নেই। আড়তদারিতে সংগঠন, মহাজনি কারবারে সংগঠন, ছোট-বড় ব্যবসায় সংগঠন। এমনকী, পাড়ার পুজো কমিটিও সংগঠনের দখলে — ক্লাবগুলি চালায় সংগঠন। আমরা সেসব মেনেও নিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম এই সর্বত্রগামী সংগঠন গড়ে তোলা দরকার। তা হলেই সরকার টিকবে। সরকার টেকানো তো ভুখা মানুষের জন্যেই। ভিতরে ভিতরে সংগঠনের সর্বত্রগামিতাকেই আমরা যেন প্রগতি হিসাবে ভাবতে শুরু করেছিলাম।

আমরা ভুলে গিয়েছিলাম, একটা সংগঠন এভাবে সর্বত্রগামী হলে, ক্ষমতাও সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে— নিজেকে জাহির করতে চায়। সংগঠন যে আদর্শের অধীন, এ-কথা তাকে প্রতি মুহূর্তে মনে রাখতে হয়। সংগঠনের কার্যক্রমে-চর্চায় সব সময় নির্ভুল দিক নির্দেশ রয়েছে কি না তাই মূল বিচার্য। এই ক্ষমতাকে তাই সব সময় অত্যন্ত সচেতন থাকতে হয়। কেন সে আছে, কী তার উদ্দেশ্য, কী তার পথ, প্রতিটি প্রয়োগে এই চর্চার ছাপ একান্ত দরকারি। বাকি সব গৌণ। উদ্দেশ্যই যদি স্থির না থাকে, তবে ক্ষমতা, সংগঠন কেন? আর এখানেই রয়েছে সবচেয়ে বড় সমস্যার বীজ। আমাদের রাজ্যের সবচেয়ে বড় সরকারি দলটি কবেই বিস্মৃত হয়েছে তার আদর্শের কথা। কবেই তার সীমিত লক্ষ্য থেকেও বিচ্যুত হয়েছে। তাই ক্ষমতা এখন প্রধান কারণ, বামপন্থী লক্ষ্য তো প্রায় নেই-ই। ক্ষমতার জন্যই ক্ষমতা। বামপন্থী লক্ষ্যটা উবে যাওয়ায়, ডানপন্থী ক্ষমতার পরাকাষ্ঠাটা বেরিয়ে পড়ছে বিশ্রী কদর্যভাবে। এই দুর্নীতি রোগটা তাই হঠাৎ কিছু নয়। ক্ষমতাকে বামপন্থী সচেতনতা দিয়ে চালিত করার স্পৃহা হারিয়ে যাওয়ায়, সে দাঁত-নখ বার করে ফেলেছে। তাই গোলমালটা আপাতভাবে ক্ষমতার। কিন্তু তার চেয়েও বেশি করে বামপন্থী আদর্শ ও চর্চাহীনতার।